আ ব হ মা ন বা ং লা ক বি তা

কবিতা আশ্রম

কবিতা আশ্রম নবম বর্ষ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ ডিসেম্বর ২০১৭ বিনিময় - ২৫ টাকা

কবিতা আশ্রম অনলাইনে পড়ুন

ওয়েবসাইট : www.kabitaashram.com

যোগাযোগ : kabitaashram@gmail.com

সম্পাদক : রণবীর দত্ত

শক্তিগড়, চাকদা রোড, বনগাঁ, উত্তর চব্বিশ পরগনা ৭৪৩২৩৫

দূরভাষ : ৯৮৩০৭৮০০৬০

সহযোগী সম্পাদক : অমিত সাহা

''বাবুই বাসা'', জামবুনি(দক্ষিণ), বোলপুর, বীরভূম-৭৩১২০৪। (৯৪৩৪৪৩১৩৬২)

মুখ্য ব্যবস্থাপক : মণিশঙ্কর

৪/২, নর্থ এভিনিউ, এ-জোন, দুর্গাপুর-৪ পশ্চিম বর্ধমান। (৯৯৩২৪০০৩৫৭)

প্রকাশক : বিশ্বজিৎ মল্লিক

নামাঙ্কন: মারুত কাশ্যপ

প্রচ্ছদ :

অলঙ্করণ :

মুদ্রক: ঋ স্টার্ট কম্পিউটার

সূচিপত্র

. অপ্রকাশিত বিনয়

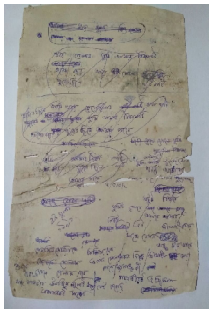

বি ন য় অ নু ভূ তি মা লা

জীবনের ধুলো মাটি জলে ● জয়দেব বাউরী

৪--৮

প্লেটোর কলম ● সুকৃতি

৯--১১

বিনয় মজুমদারের কবিতা:

কিছু মৌন কিছু মুখরতা ● ফাল্গুনী ভট্টাচার্য

১২--১৫

পতঙ্গশিকারী ● সুমন গুণ

১৬--১৭

ওষুধের প্রয়োজন হলে উপপাদ্য নিয়ে বসি:

বিনয় মজুমদার ● কার্ত্তিক নাথ

১৮--২০

বিশ্বের বালকটিকে দেখে ● পার্থজিৎ চন্দ

২১--২৩

কী এক ব্যথার ময়ূর বাজছে ● প্রলয় মুখোপাধ্যায়

২৪--২৬

এসো হে নদী এসো অসীম ● মণিশঙ্কর

২৭--২৮

এক দৈবী হওয়া● পার্থসারথি দে

২৯-৩০

শাশ্বত রহস্যের অনুধ্যান● অমিত সাহা

৩১--৩২

উপদেষ্টা মণ্ডলী : কার্তিক নাথ, রজতকান্তি সিংহ চৌধুরী, বিভাস রায়চৌধুরী, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, শাহেদ কায়েস, মাহমুদ টোকন, শান্তনু হালদার

সম্পাদক মণ্ডলী : চিরঞ্জিত সরকার, অভিমন্যু মাহাত, স্বরূপ চন্দ, অর্ঘ্য দত্ত, জয়দেব বাউরী, অমিত কুমার বিশ্বাস, সুবীর সরকার, বিকাশ কুমার সরকার, কুমারেশ তেওয়ারী, অর্ঘ্য মণ্ডল, ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়

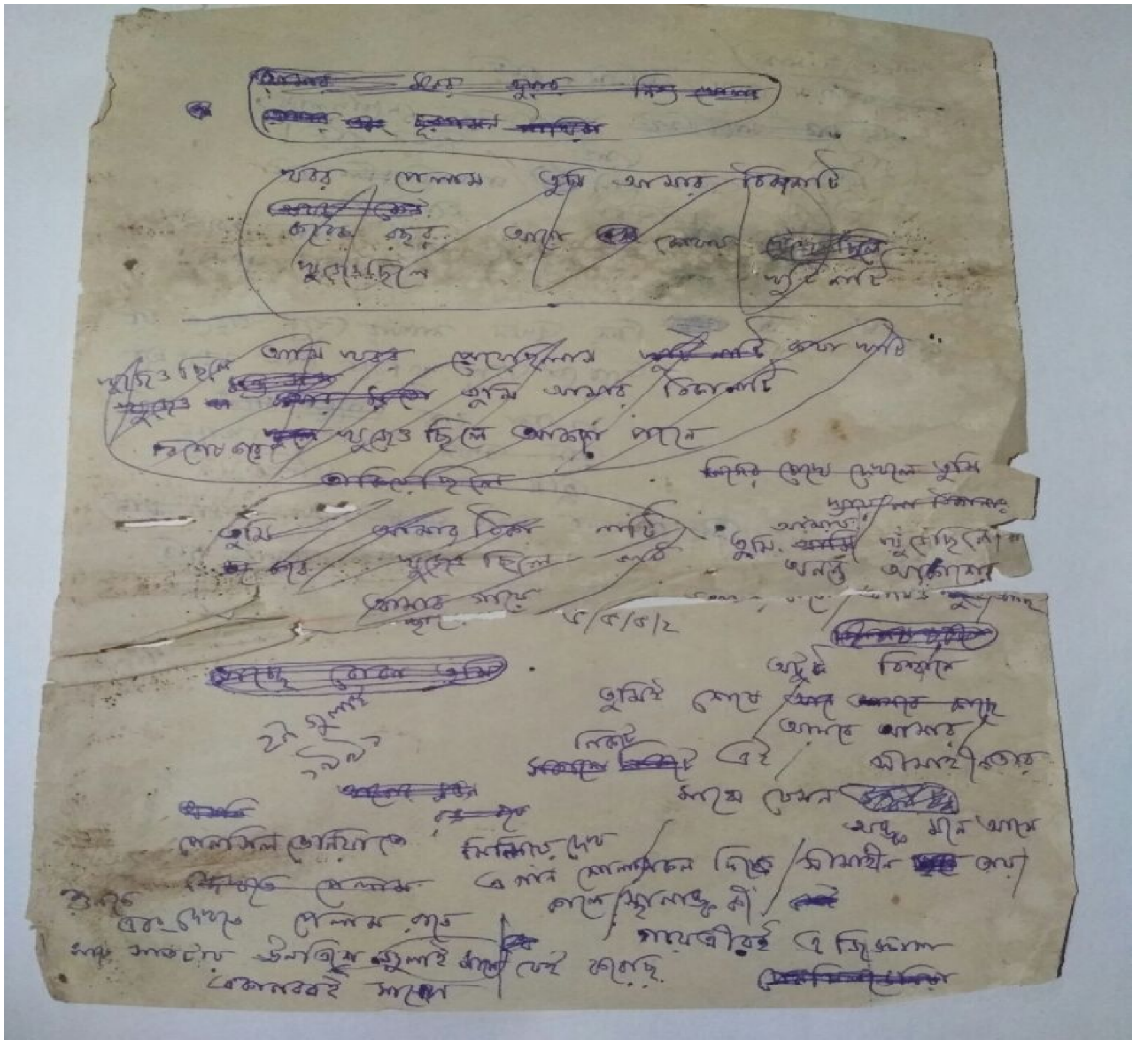

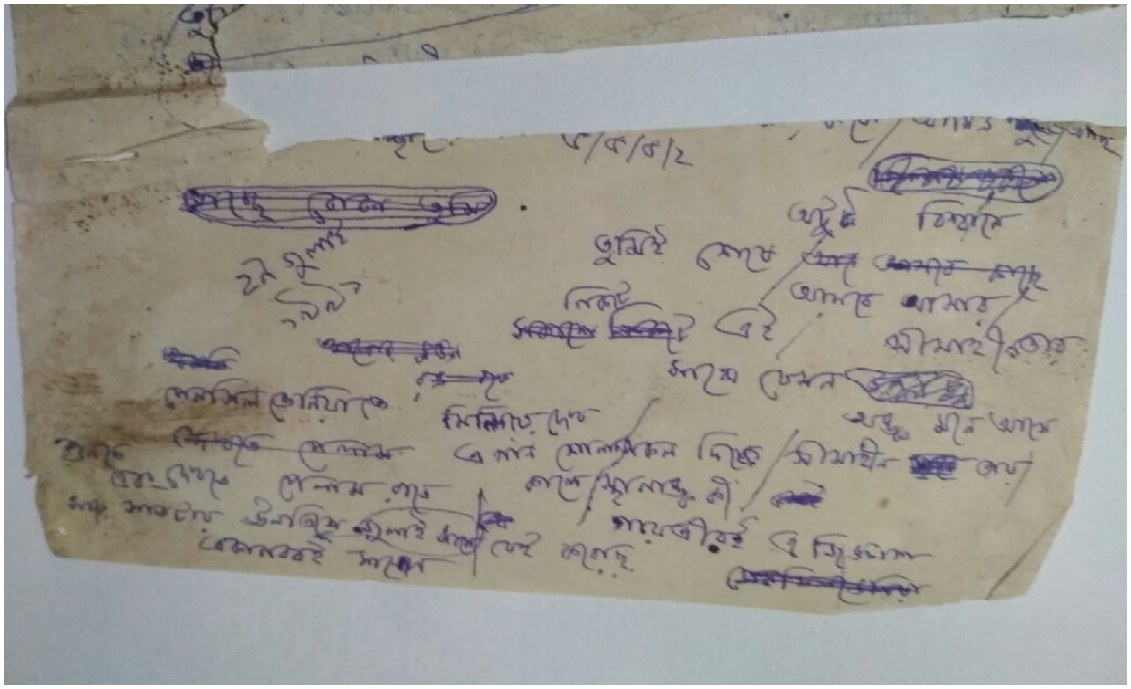

বিরহ অতীত, তাঁর ফিরে এসো চাকা’

জয়দেব বাউরী

কথামুখ

বারো-চৌদ্দ? নাকি আরো ক’বছর আগে পরে হবে?
গঞ্জ-গ্রাম মেশামেশি, কবিতায় মেতে ওঠা ছেলে;
কীভাবে সে জেনেছিল ‘ফিরে এসো চাকা’টির কথা?

কথা তো সামান্য ছিল, সংবাদ নিরিখে। ‘একাকিত্ব’
‘অসহায়’,‘অসুস্থতা’-- এইটুকুই ছেপেছিল খবর কাগজ।
আর ছিল প্রিয় এক কবির কৌশলী প্রতিক্রিয়া--
‘বিনয় তো লেখেনা আর। সুস্থ হয়ে লেখায় ফিরুন...’

শুরু হল খোঁজাখুঁজি। কেটে গেল মাসাধিক কাল।
হঠাৎই মেলার মাঠে একদিন হাতে এল ‘চাকা’!

কিছুই জানি না সেই বইটির পূর্বাপর কথা।
জানি না কবির কোনও মতাদর্শ, কবি পরিচিতি।
পৃষ্ঠা খুলি বসি, আর ভাবের অরণ্যে লাগে ঘোর।

বিরহ পলাশ আর প্রেমের আরতি শালফুল।
এসব ছাপিয়ে উঠে জড়-জীবনের কথকতা;
অরণ্যে, আকাশে তার ব্যপ্তি গোটা চরাচর জুড়ে।

আজ, এত দিন পর রয়ে গেছে একই মুগ্ধতা।
নিছক বিরহ নয়, প্রেম নয়, নিগূঢ় সুদূর...
নির্জন স্থাপত্য এক দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন একা।

মুগ্ধতাকে ভেঙেচুড়ে কীভাবে দেখাবে, বলো আজ?
ভাঙা যায়? সবকিছু? ঘোর লাগা মায়া অনুভব?
আমার তো চেয়ে থাকা, তলিয়ে যাওয়া ছিল শুধু।
বলা তো সামান্য তাই, স্পর্শে রাখা আছে বাকিটুকু।

নামে কিছু আসে যায়

‘চাকা’-- এই শব্দটি গতির প্রতীক হয়ে আলোকিত সভ্যতার কথা বলে যেন।

আর সেই চাকা যদি জীবনরথের থেকে খুলে চলে যায়, গড়িয়ে সুদূর?
অমূল্য জীবনরথ স্বাভাবিক স্তব্ধ হয়, তার কাছে থেমে যায় বিশ্ব চরাচর।

কবি তো জানিয়েছেন 'চক্রবর্তী' ভেঙেচুরে 'চক্র' কে প্রাকৃত করে তার থেকে 'চাকা'

এতটা এলেন কেন? কেবল বিরহ ঘোর? আশা নিরাশায় দোলা প্রেমর্তির জের?

তখন তো জানিও না হলুদাভ প্রেক্ষাপট, পিছনের এইসব ঘটনাপ্রবাহ। সার্থক কবিতা, তার কালখণ্ড, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞান পার হয়ে আসে তার পাঠকের কাছে। সম্পূর্ণ নতুন রূপে ধরা দেয়, থেকে যায় চিরস্থায়ী ভাবে।

সেভাবেই এসেছিল। যতবার পড়ি কেন, যত শুনি আলোচনা এখানে ওখানে;
প্রথম পাঠের সেই ছায়াছবি আজো যেন চোখে এসে স্থির হয় অবিকলভাবে।
অনন্তের যাত্রী এক নির্জন পথের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে একা একা।
চাকা তার খুলে গিয়ে চেনা পথ থেকে নেমে গড়িয়ে গিয়েছে বহু, বহুদূর।
থেমে গেছে সে জীবন, থেমে গেছে চরাচর; গভীর বিস্ময়ে তাই যাত্রীটি দেখেন
মানুষের, উদ্ভিদের, পদার্থের নানা ধর্ম মাখামাখি হয়ে আছে আশ্চর্য রকম।
জগতের সত্যগুলি কীভাবে নিহিত আছে, মিলিয়ে দেখেন তিনি জীবন গভীরে।

পূর্ণাঙ্গ পুস্তক জুড়ে দেখি, কোনও কবিতারই কোনও শিরোনাম নেই। সংখ্যায় চিহ্নিত।
কবিতাগুলিরে যেন ভর-কেন্দ্র একটাই; অমোঘ আরতি সেই 'ফিরে এসো চাকা।'
অর্থাৎ চাকাটি ফিরলে যে জীবন থেমে গেছে পুনরায় গতিশীল হতে পারবে তো।
অথচ এই যে চাকা, প্রগতির আলোহীন, আধো-ছায়া অন্ধকার; থেমে থাকা রোদ।
বিনয়সভ্যতা তার দু'পাশেই গড়ে ওঠে পরিপূর্ণ বিকশিত; সন্দেহ অতীত।

অবচেতনের আলো

অবচেতনের আলো, পরিচ্ছন্ন চিত্রকল্প অনবদ্য উপমায় গড়ে ওঠে তার
কাব্যে নির্মেদ কায়া। পুস্তকের '৮ মার্চ, ১৯৬০'র এই কবিতাটি দিয়ে
শপরু তার যাত্রাপথ। প্রথম পাঠের পর সে সময় মনে হত এই কবিতায়
কবি বুঝি চিরন্তন খাদ্য আর খাদকের গূঢ় সম্পর্কের কথা বলতে চেয়েছেন!
প্রথম স্তবকে ওই 'একটি উজ্জ্বল মাছ' আর দ্বিতীয় স্তবকে 'বিপন্ন মরাল'
ও 'উদগ্র উষ্ণ মাংস' ক্রমাগত নিয়ে যেত ওই ভাবনাটির দিকে।
কিন্তু যখনই
শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে ঢুকে এসে দাঁড়াতাম, পূর্বেকার ধারণাটি এলোমেলো হয়ে
পথ হারিয়ে ফেলত। থমকে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোনও উপায়ই থাকত না তখন!
'শ্বাসরোধী কথা' এই শব্দবন্ধে ঘেঁটে যেত; নিজেকে ফেরাত হত প্রথম স্তবকে।
শুধু তো 'মিলন' নয়। 'মিলনের শ্বাসরোধী কথা'--রতিক্রিয়া চিত্র, তার আওয়াজ
অস্ফুটে বেরিয়ে আসে; নিগূঢ় যৌনতা বোধ উদ্ভাসিত হতে চায় পাতার আড়ালে।
কিন্তু, 'যে যার ভূমিতে।' অর্থাৎ সংযত স্থিত। অথচ অতল স্তরে তীব্র, মুখর।
আর এই যৌনতা ইচ্ছা, সব বৃক্ষ, পুষ্পকুঞ্জে চিরকাল থেকে একভাবে বিরাজিত।
প্রথম স্তবকে সেই 'একটি উজ্জ্বল মাছ' যা দৃশ্যত সুনীল কিন্তু 'প্রকৃত প্রস্তাবে
স্বচ্ছ 'পুনরায় ডুবে গেল'-- তাহলে তো সেই যৌনতা তৃপ্তির সহার্থক জলে কিছু?
'প্রকৃত প্রস্তাব' পেয়ে তারপর ডুবে গেছে; 'আর সেই স্মিত দৃশ্য দেখে নিয়ে' ফল
'বেদনার গাঢ় রসে আপক্ক রক্তিম হল'-- লজ্জা আর প্রত্যাখ্যান জনিত বেদনা
একাকার হয়ে গেছে এই পঙ্‌ক্তিতে এসে। কিন্তু পরের স্তবকে 'বিপন্ন মরাল'
তার 'উষ্ণ মাংস', 'মেদ'- আমাদের নিয়ে চর্যাপদে-'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী'তে

''যেহেতু সকলে জানে তার সাদা পালকের নীচে
রয়েছে উদগ্র উষ্ণমাংস আর মেদ।''

বিজ্ঞান চেতনা আসে--'সমস্ত জলীয় গান বাষ্পীভূত হয়ে যায়'। ঠিক সে ভাবেই
যৌবন দীঘির জল কালক্রমে বাষ্পীভূত, শুকিয়েই যাবে শেষে, ঠিক একদিন।
এখন অথই দিঘি, সুবর্ণ সময়। তবু, প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে 'সমুদ্র মৎস'
স্বচ্ছ জলে ডুবে গেছে; মরাল, 'উদগ্র উষ্ণ মাংস আর মেদ' নিয়ে 'পলায়ন করে'
'অবিরাম'। আর সেই হতাশায় সহমর্মী অসুস্থ বৃক্ষেরা যেন ব্যপ্ত বনস্থলী

'দীর্ঘ দীর্ঘ ক্লান্ত শ্বাসে আলোড়িত করে' তোলে। অবদমিত বাসনা একাত্ম হয়েছে

শেষে প্রকৃতিতে এসে। প্রকৃত প্রস্তাব আর বিরহ অতীত-- এই প্রাণের প্রকৃতি
ধর্ম,তীব্র ভোগ, স্পৃহা জেগে আছে অবচেতনের আলোয়, শৈলীর সুষমায়।

১৯৬০ সালের ২৬ আগস্ট লেখা এই কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতাটি। প্রায় পাঁচ মাস পর লেখা এই কবিতায় মৃত্যু চেতনার কথা এসেছে হঠাৎ।
জীবনের তাৎপর্য, জীবনের প্রতি তাঁর গভীর আসক্তি আর তার সার্থকতা,
তথা মূল্যায়ন, মৃত্যু চেতনার আলো জ্বেলে রেখে তিনি যেন নির্ণয়ে সচেষ্ট।
জীবনের স্থায়ীকাল নিতান্ত সামান্য। কবি লিখেছেন--
''মুকুরে প্রতিফলিত সূর্যালোক স্বল্পকাল হাসে।''
--এই যে মুকুরে এই অনন্য প্রতিফলিত সূর্যালোক -- এইটুকু জীবনের ধন।
যার স্থায়িত্ব অল্পই। তার চতুর্দিক পূর্ণ মৃত্যুময় হিমে। এই জীবন মধুর। কিন্তু এ তো জীবনের একটা পিঠ। উল্টো পিঠে আছে তুমুল তিক্ততা।'লবণের মতো।'
কণা কণা কী ছড়ায় কে জিহবার উপর-যা দ্রবীভূত হয়ে যায় নিমেষের মধ্যে!
রয়েছে আনন্দ সুখ। রয়েছে বিষাদ, দুঃখ। রয়েছে জীবন মৃত্যু। 'স্নিগ্ধ দেবদারু'
শিক্ষায়তনের কাছে 'যা নিশ্চল, যা কবির'ই প্রতীক- তিনি কতটা সচেতন; মৃত্যু
জীবনের অনিবার্য পরিণতি নিয়ে? কবি লিখেছেন--
''তুমি বৃক্ষ,জ্ঞানহীন,মরণের ক্লিষ্ট সমাচার
জানো না, এখন তবে স্বর শোনো, অবহিত হও।''
পদার্থ-জীবন-জড়, জগতের সত্যগুলি পর্যবেক্ষণের দ্বারা উপলব্ধি--
''সুস্থ মৃত্তিকার চেয়ে সমুদ্রেরা কত বেশি বিপদসংকুল
তারো বেশি বিপদের নীলিমায় প্রক্ষালিত বিভিন্ন আকাশ।''
এ সত্য মানুষ জানে। তবু সমস্ত বিপদ অতিক্রম করে গিয়ে মানুষ চেয়েছে
সাগরে আকাশ তার স্পর্ধিত পদসঞ্চার...অজেয় কিছুই প্রায় নেই মানুষের কাছে।
সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে তবু, আজো--
''মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়।''
'প্রকৃত সারস'-- কোন অবচেতনের থেকে উঠে এসে শব্দবন্ধ বসেছে চরণে।
কোন অনিন্দ্যসুন্দর ধারণার দিকে, কোন নান্দনিক বোধভূমে আমাদের নিয়ে যান কবি।
কোন নিগূঢ় সত্যের মুখোমুখি নিয়ে গিয়ে পাঠক'কে দাঁড় করিয়ে দিতে চান তিনি?
চরম অনুশীলন, বুদ্ধিমত্তা, ভালোবাসা, অদম্য আগ্রহ, নেশা সবকিছু দিয়ে
সমুদ্র-আকাশ জয় করা হয়ে গেছে তবু, 'প্রকৃত সারস' উড়ে চলে যায় 'মানুষ নিকটে গেলে'! অর্থাৎ, প্রকৃত ওই সারসের যোগ্য আজো নিজেকে করতে পারেনি মানুষ।

উপপাদ্যধর্মী

উপপাদ্যধর্মী এর চলন রয়েছে তার কিছু কবিতায়।
যেন প্রামাণ্য বিষয়টি প্রথমে উল্লেখ করে নিয়ে খুব ধীরে ধীরে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তি দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠা করেন।
শেষে এসে পুনরায় প্রথম পঙক্তিগুলির কাছে ফিরে যান।

২০শে জুলাই,১৯৬১'র কবিতাটি এইভাবে শুরু--
''নিকটে অমূল্য মণি, রত্ন নিয়ে চলার মতন
কী এক উৎকণ্ঠা যেন সর্বদা পীড়িত করে রাখো।''
অতঃপর নেমে এসে উদাহরণের কাছে; যুক্তিতে দাঁড়ান
যে--ক্ষতবিক্ষত কারো/ সমুদ্র স্নানের মতো 'লোনাজল ভীতি ছেয়ে আসে।
আর ঠিক তখনই সমস্ত উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত যিনি করতে পারেন সেই বিশিষ্ট জনের নির্দিষ্ট অবস্থানের ধোঁয়াশা চিন্তিত করে তাঁকে।
'পৃথিবীর বুক থেকে সহসা বাতাস ' যদি একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় তাহলে যেমন সব কীর্তি','সবার জীবন' নিমেষেই ধ্বংস হতে পারে।
ঠিক সেইভাবেই যদি সমস্ত সম্ভাবনা'ই তিলে তিলে শেষ হয়ে যায়, তবে অন্তরের ফুল, সকল জীবন--'কবি-পৃথিবী' ধ্বংস হয়ে যাবে।
কিনতু ক্ষুদ্র সম্ভাবনা আর প্রবল সংশয় আজো রয়ে গেছে তাঁর। তাই--
''...বকুলের মতো শেষে/শুকিয়ে খয়েরি হয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে মালিকায়/
কোনওদিন আসবে কি''। নিশ্চয়তা নেই, তাই উৎকণ্ঠা; লোনা জলে স্নান।
আর, শেষে ফিরে আসে কবিতার সূচনায় উল্লিখিত সেই পঙক্তি দুটি।

এভাবে ২২ জুন ১৯৬২'র লেখা কবিতাটিও শুরু হয়েছে
এবং শেষ' ও হয়েছে সূচনার সেই তীব্র প্রদাহের পঙক্তি দিয়েই।
''যাক, তবে জ্ব'লে যাক জলস্তম্ভ, ছেঁড়া ঘা হৃদয়''
আবারো নেমে আসেন উদাহরণে, যুক্তিতে, উপমায়, কারণ নির্ণয়ে।
শুধু তাকে যন্ত্রণার ভরে থাকলেই যেন ভুলে থাকায় সবকিছু।
'কাঁটার আঘাতদায়ী কুসুমের' মতো তার স্মৃতি, চিন্তা দীর্ঘস্থায়ী।
কিন্তু, তাঁর ঐকান্তিক এই যন্ত্রণার এক মধরিতা খুঁজে পাওয়া যায়।
যখন তিনি বলেন,...*প্রথম মিলন কালে ছেঁড়া/ ত্বকের জ্বালার মতো গোপন'*; তাই কি তিনি এই মধুর-বেদনা এইভাবে উপভোগ করতে চান!
এবং কবিতার শেষে এসেই সূচনার পঙক্তির কাছে ফিরে যান?
এভাবেই লেখা তাঁর ২২ জুলাই ১৯৬১ র কবিতাটিও।

উপমায় শৈশব

শৈশব কালীন সময়ের নানা অনুসঙ্গ তাঁর কবিতায় উপমা হিসাবে এসেছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই।'উৎফুল্ল আশা নিয়ে' সকালবেলায় ঘুম থেকে জেগেছেন কবি। বেশকিছু ইতিবাচক ভাবনা কবিমনে রোদ হয়ে আছে। হঠাৎ উড়ো মেঘের মতো কবেকার বিশিষ্টাকে কাল্পনিক বলে মনে হয় তাঁর। কিংবা অবৈধ পুত্রকে ত্যাগ করে চলে যাওয়া কোনও কে রমণীর মতো।

তাই, এক নিগূঢ় বেদনা গভীর গোপনে তাঁকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। তথাপি ইতিবাচক তিনি--সময়ের সঙ্গে একদিন এই ব্যাথা থেকে মুক্ত হয়ে উঠবেন কবি। এবং তা কত সরল, অনায়াসে। সহজ উপমা--

"মাঝে মাঝে অগোচরে বালকের ঘুমের ভিতরে
প্রস্রাব করার মতো অস্থানে বেদনা ঝ'রে যাবে।"

শৈশবের সরল বিকাশ, সহজাত রীতি, প্রকৃতিগত অভ্যাস অনারোপিত ভঙ্গিমার এক নিপাট সহজ সম্পর্ক, অকৃত্রিম জীবন আকাঙ্খা করেন তিনি, তাই-- *"শিশুদের আহার্যের মতন সরল হও তুমি"*

"...*বিকাশের রীতিনীতি এই*"-- এই অনায়াসে পঙক্তি অতলের থেকে উঠে আসে তাঁর।

শিশু তথা শৈশবকে, কত মমতার সঙ্গে কবি লালন পালন করতে পেরেছেন।

সচেতন স্তরে এসে সুদৃঢ় কথন

শুধুই অবচেতন নয়, সচেতন স্তরে উঠে এসে ঋজু সরে কথা বলেছেন কবি। আমরা জেনছি, স্বল্পকাল চাকরি করার পর আর কোনও জীবিকা গ্রহণ করেননি তিনি। কবিতা লেখাকেই পূর্ণ সময়ের কাজ হিসাবে নিয়েছিলেন। অথচ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে এক দোলাচল যেন টের পাওয়া যায়। একদিকে ধ্যানের, অপার্থিব সৌন্দর্যের, সৃজনের মধুর জগৎ অন্যদিকে ক্ষুধা,তৃষ্ণা নিবৃত্তির মগ্ন আয়োজন-- এই দ্বন্দ্বের বিষণ্ণতায় থাকা কবি লিখছেন--

" করুণ চিলের মতো সারাদিন, সারাদিন ঘুরি
ব্যথিত সময় যায় শরীরের আর্তনাদে, যায়
জ্যোৎস্নায় অনুনয়; হায় এই আহার্য সন্ধান।"

স্পষ্ট উচ্চারণ তাঁর, "*আমি বারংবার অসফল,ক্ষমতা বিহীন*" আর তাই নাগালের বহুদূরে বিচরণকারী প্রণয়নীকে দ্ব্যর্থহীন ভাবেই বলেন --"*তোমাকে তো ঈর্ষা করি; হে পাবক, তুমি সবকিছু/ গ্রাস করে নিতে পারো--তোমার বাঞ্ছিত যুবকের / জীবন মরণ, মন যেন; কখনোই প্রেমে ব্যর্থ নও।*"

অথচ তারপরে কোনও বসন্তের ডালপালা তাঁকে যে স্পর্শ করেনি এমন নয়--

কিন্তু,

"অনেকেই ছুঁয়ে গেছে, ঘুম ভেঙে গেছে বারবার।"

"ত্রুটিপূর্ণ মুকুরের মতো তারা আমাকে প্রায়শ

বিকৃত করেছে; হায় পিপিলিকা শ্রেণীতে একাকী

কীটের মতন আমি অনেক হেঁটেছি অন্ধকারে।"

উনিশশো ষাটের লেখা কবিতাগুলি অনেক বেশি অবচেতনের। কিন্তু, ক্রমে একষট্টির কবিতায় সচেতন ও অবচেতনে চলাচল করেছেন তিনি। অনেক কবিতাতেই উপরের উদাহরণের দেওয়া কবিতাগুলির মতো নিয়ন্ত্রিত, সচেতন, ঋজু , স্পষ্ট আর সরাসরি--"*বেশ কিছুকাল হলো চলে গেছে প্লাবনের মতো*" তারপর অনবদ্য এক উপমায় পরবর্তী পরিস্থিতি চারপাশের নিরিখে বর্ণনা করেছেন-- *"চর্তুদিকে সরসপাতার/ মাঝে মাঝে শিরীষের বিশুষ্ক ফলের মতো আমি/জীবন যাপন করি।"*

বিষয়ীর বিষয়ে না থাকা

কবি জানিয়ে ছিলেন বিষয় অভাবে লেখা মাঝে মাঝে বন্ধ রাখতেন তিনি।

অথচ অনেক লেখা নির্দিষ্ট বিষয় ছেড়ে বিষয়হীনতার দিকে লীন হতে চায়!

কবিতার ভরকেন্দ্রটি, কবিতার কোনোখানেই নেই। ভরকেন্দ্র থাকলেও, তা আছে অনেক বাইরে-আকাশ, হাওয়ায়; মাটিতে অরণ্যে,জলে;ডালে ডালে অথবা পাতায়।

পাঠক পঙক্তির পর পঙ্ক্তি ভেঙে যেতে যেতে পৌঁছাতে চেষ্টা করে কোথাও না কোথাও।

তার চায় উত্তরণ, নতুন ধারণা কিংবা আলোকিত অন্য কোনও রোদ।

অনবদ্য সূর্যাস্তের বিবরণী দিয়ে শুরু হচ্ছে একটি কবিতা। আকাশের কোলে সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু যখন, নদীর জলে তার লম্বা ছায়া এসে পড়ছে। ভেতরে রয়েছে স্রোত। তিরতির করে কাঁপছে জলের উপরিতল। মনে হচ্ছে যেন--

"স্রোতপৃষ্ঠে চূর্ণ চূর্ণ লোহিত সূর্যাস্ত ভেসে আছে;
নিশ্চল, যদিও নিম্নে সংলগ্ন অস্থির স্রোত বয়।"

-- সূর্যাস্ত, শেষের কথা বলে। অথচ যখন স্বাভাবিকভাবে না হয়ে বাধ্য হয় -- শেষ হয়ে যেতে? 'চূর্ণ চূর্ণ' শব্দে অদ্ভুদ নাছোড় এক কষ্টের দ্যোতনা ঘনিভূত হয়ে আছে যেন। যেন কোন দুরন্ত শিশুকে খেলার মাঠের থেকে পাঁজা কোলা করে,

জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে! সন্ধ্যাকাল নামার আগে ঘরে নিতে চাইছে কেউ।

আর দুরন্ত শিশুটি হাত-পা ছুঁড়ে একেবারে ভেঙেচুরে যেতে চাইছে! খাণিক পরেই
সে যেমন শান্ত হয়, এই সূর্যাস্ত ও চূর্ণ চূর্ণ হয়ে ভেসে আছে নিশ্চল;

অথচ
তার নীচে বয়ে যাচ্ছে অস্থির অদম্য স্রোত, ওই শিশুর না ফিরতে চাওয়া ইচ্ছের
মতো। আর, এরকম বিষণ্ণ বেলায় এক পাখির ঠোঁটের থেকে বেঁচে যাওয়া মাছ
আহত শরীর নিয়ে চলে গেছে বহুদূরে। হতাশ পাখিটি তাই পিছনে ফিরে আছে।
এই চারটি পঙ্‌ক্তির যত কথকতা, যত চিত্র--একটি ফ্রেমের মধ্যে এসে বসেছে যেন।
পরের চারটি পঙক্তির দৃশ্যপট, তার রঙ, রঙহীনতা ও অভিমুখ কোথায় ফেরানো--

''এখানে রয়েছে এই বর্ণময়, সুস্থ পুষ্পোদ্যান;
তবুও বিশিষ্ট শোকে পার্শ্ববর্তী উদাত্ত সেগুন
নিহত, অপসারিত, আরনেই শ্যামল নিস্বন।''

'বিশিষ্ট শোক'টি ঠিক কী ? যা পাশেই বর্ণময়, সুস্থপুষ্প উদ্যানের উপস্থিতি সত্ত্বেও
উদাত্ত সেগুন গাছ'কে শান্ত, স্বাভাবিক হতে দেয় না, ইতিবাচক ভাবনার দিকে নিয়ে যায় না!
শোক' কে অতিক্রম করতে না পেরে, পুষ্পোদ্যান'কে দেখেও আসক্ত হতে না পেরে'বিশিষ্ট শোকে' নিহত হয়েছে। তাই কবির ঐকান্তিক প্রশ্ন--

''কেন ব্যথা পাও বলো, পৃথিবীর বিয়োগে বিয়োগে?''

শেষের ছয়টি পঙ্‌ক্তিতে জগতের চিরন্তন এক সত্যের কাছে নিয়ে যান পাঠক'কে।
যেখানে অরণ্যে কান পাতলে ঝিঁ ঝিঁ পোকা দের রব; কান্না হয়ে চিরকাল
বয়ে চলেছে তরুমর্মরের মধ্যে কিম্বা পাতার আড়ালে। অর্থাৎ অপচয়, বিয়োগ
পৃথিবীর সত্য। তাই শোক আছে। তরুমর্মরের মধ্যে সর্বদাই বিরাজ করছে
এক ক্ষীণ ক্রন্দনের রোল। এই সত্য বুঝে নিয়ে তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়াই জীবনের ধর্ম।

বিনয় সভ্যতা। তার শিকড়, অনেক নীচে। তাই প্রজন্মের
পর প্রজন্ম বিস্মিত, মুগ্ধ। সব মুগ্ধতার প্রকাশও বর্ণে

রঙে ঠিক ঠিক করা সম্ভব হয়ে ওঠে না অনেক সময়েই।
আজো শুধু মনে হয়--
সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভেদী অনুপম উপমা সৌকর্য, পয়ার ও মহাপয়ারে
কাব্য কাঠামো নির্মাণ, ইতিবাচক জীবনবোধ,বিজ্ঞানী সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি
তথা গভীর দর্শনে ঋদ্ধ ''ফিরে এসো চাকা'' বাংলা কবিতায় এক চিরন্তন ভাস্কর্য।

বি ন য় অ নু ভূ তি মা লা

প্লেটোর কলম

সুকৃতি

রিপনের প্রসঙ্গ আবার চলে আসে অনুপম মুখোপাধ্যায়ের কথা
মনে পড়লেই রিপনের মনে হয় অনুপমদা ও মার
গলার ভয়েজ এক। এবং এই কথা বলেই ও আমাদের
পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন কৌরবের স্টলের সামনে।
আমি অনুপম মুখোপাধ্যায়ের কর্ণ লেখাটা পড়েছি
কিন্তু বেদব্যাসের মহাভারত পড়িনি বলে
ভিড়ের ভিতরে মিশে রিপনের সাথে বইমেলায় টানছি আগুন।

লিটল ম্যাগাজিনের গলিতে তখন শায়কের হাত ধরে
টানছে দিশারী, দিশারীকে কম বেশি অনেকেই চেনে।
চোখ না থাকলে কপালে শরীর আঁধারে ঝরিয়ে দ্যায়
কারণ শরীর অন্ধ, কারণ শরীর অন্ধকার ভালবাসে।
দিশারীকে ভালবাসে বন্ধুরা সবাই,
প্লেটোনিক লাভের মতন বইমেলায় ধুলো ওড়ে. . .

ঠেকের সামনে, রিপনের সাথে পৌঁছে যায় আরেক রিপন,
সন্ধ্যায় সুপ্রভাত আসে, তার কালচে জামার কনুইতে
ঘষা লেগে ঘরের দেওয়ালের চুনকাম. . .; কাম কাম ভাব
বন্ধুদের সবার ভিতবে...
. আমরা ভাবছিলাম শায়কের সাথে আজ
মালামালি হয়ে যাবে দিশারীর
বাওলামি হয়ে যাবে আজ

শায়কের সাথে দুই রিপনেরই
কিন্তু না। প্লেটোর সাথে ওদের সবার দেখা হয়ে গেল
লিটল ম্যাগাজিন স্টল গুলোর পেছনে।
অন্ধকার গলিতে বন্ধুদের পিণ্ডি চটকাচ্ছে বন্ধুরা আর
সিগারেট খালি করে ভরছে তামাক।

এবড়ো খেবড়ো রং এর বন্ধুরা কবিতা পড়ছে...
প্লেটোর কাছে সবাই সমান তবু
প্লেটোর ভালো লাগে শ্রেয়সীর লেখা
শায়কের শ্রীময়ীরটা ভালো লাগে যেরকম।
রিপনের সবার লেখাই ভালো লাগে
প্লেটো, তলস্তয়, ইউবুলিডিস, দেরিদা ও ফুকো
রিপন সবার ফ্যান, অথচ আমরা
শায়কের চাঁদ হারালে ওকেই সন্দেহ করেছিলাম, ওর
কাঁধেতে ঝোলানো ব্যাগে লেখা ছিল চাঁদচোর।

প্লেটোর কলম কিছুদিন বেশ অসুস্থ হয়ে আছে,
কালিতেও জোর নেই মনে হচ্ছে লেখার সময়।
মাঝে মাঝে এরকম হয়, এরকম হলে শরণাপন্ন হতে হয়
ডাক্তার বিনয় মজুমদারের কাছে
ডাক্তার বিনয়মজুমদারের সংস্পর্শে থাকলেই
কলম টাটিয়ে ওঠে লেখার কারণে -- মোটা দাগ, ঘন কালি
তেজস্ক্রিয় নালির ভিতর দিয়ে নেমে আসে লেখার প্রবাহ

লেখে আর স্প্রিংএর মতো লাফায় কলম, শান্তি নামে।
পৃথিবীর গভীর গভীরতর হ্রদগুলি ঘন হয় লবণের চাপে,
জগৎ নোনতাময়; জল, ঢেউ, স্রোত, বাধা... সব ঠেলেঠুলে
নিজেকে ডুবিয়ে দ্যায় যতটা কলম, তত মিষ্টি, মিষ্টি লাগে
গভীরতা, আস্তে আস্তে করে খাই ভাললাগে
দেওয়ালে তখন, মনে হয় মাথা ফাঁকা হয়ে গেছে
এবার কলমীর মতো নির্লজ্জ বাজবে
সক্রেটিসের সামনে। হে মহান হেমলকধারী,
আপনিই তো বলেছিলেন, বিয়ে করো
যদি বউ ভালো হয় তো সুখী হবে আর
খারাপ হলে তুমি হবে দার্শনিক
অথচ দার্শনিকেরা সুখি হতে চায়, চেয়েছিল।

হে মহান সক্রেটিস, আপনি কি বিনয় মজুমদারকে চিনতেন?
বিনয় মজুমদারকেও বলতে শুনেছি
'বিয়ে করো'
রণজিৎদাকে বলতেন, 'রণজিৎ বিয়ে করো, বিয়ে করো'
রমনদাকেও বহুবার বলেছেন, 'রমন বিয়ে করো, বিয়ে করো'।
রণজিৎদা বিয়ে করে নিলেন কিন্তু
রমনদা বিয়ে করলেন না
আমরা অপেক্ষা করছি রণজিৎদা
দার্শনিক হয়ে ওঠে কিনা:
আমরা অপেক্ষা করছি, বিয়ে না করেও রমনদা নিজেকে
কাটাচ্ছেন...
কিভাবে জানি না। আমারা কেবল অপেক্ষা করছি
রমনদা বড় নেতা হয়ে ওঠে কি না,
রমনদা রাজনীতি ছেড়ে দেয় কি না...
আমরা অপেক্ষা করছি প্লেটো
বড় দার্শনিক হয়ে কী প্রমাণ করতে চায়!

পুরুষ পুরুষই থাকে, যেন প্লেটোর কলম
প্রতিটা পুরুষের কলমই প্লেটোর কলম
অন্ধকারে যেন আরও ভাল লেখে, এক মনে
একটা জায়গায় বারবার লিখে চলে একই লেখা--
সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো, প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল আর
অ্যারিস্টটলের শিষ্য দ্যা গ্রেট আলেকজাণ্ডার
উনিও জানতেন
বিয়ে না করলেও প্লেটোর কলম তবু চলে

বিনয় মজুমদারও চালিয়েছিলেন বাল্মীকির কবিতায়,
অঘ্রাণের অনুভূতিমালায় চালিয়েছিলেন।
অথচ ওনাকে বলতে শুনেছি বহুবার
ওনার একটা বই মোটে 'ফিরে এসো চাকা'।
শক্তিরও একটা মোট বই 'হে প্রেম - হে নৈঃশব্দ' আর
জীবনানন্দের 'সাতটি তারার তিমির'-- বলেই
ওনার নিজস্ব সুরে 'শকুন' কবিতাখানি
মুখস্থ বলতে লাগলেন।

তবে জাতকে বিশ্বাসী বিনয়দা
একদিন দুপুরে বলছিলেন
'বিনয় পিটক' আর অঘ্রাণের অনুভূতিমালার বিষয় বস্তু যদি এক হয়
তবে আমি বুদ্ধেরই জাতক হয়তো বা ।'
কথাটাকে কোট করে দিলাম। কারণ স্পষ্ট মনে আছে
বিনয়দা এই কথাটাই বলেছিলেন সেদিন
দুপুরবেলায় আকাল বিষণ্ণ হয়েছিল
একটা শালিক পাখি বিনয়দার ঘরের জানলার শিকে বসে,
আরেকটা বারান্দার রেলিং-এ
বিনয়দা জানলার দিকে তাকিয়ে থেকে
একটা লাইন বললেন--
''সেইসব পাখিগুলো, মালা হয়ে উড়ে গেল যারা
তারা আর মালা হয়ে ফিরে এলো না তো...'
শক্তি লিখছে, বুঝলে?'' তারপর উনি পুরো কবিতাটাই
মনে করে বলে চললেন । যদিও বা
কবিতার নামএ - মুহূর্তে মনে পড়ছে না, তবু
শঙ্খমালা হতে পারে। জিজ্ঞাসা করলাম
বিনয়দা কোন বইতে আছে এই কবিতাটা!
''হে প্রেম, (একটু থেমে) হে নৈঃশব্দ' এইটা শক্তির শ্রেষ্ঠ বই।
অথচ শক্তির মনে হয় ওঁর চর্তুদশপদী লেখাগুলোই শ্রেষ্ঠ।
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিনয়দা
কবিতাটা সুর করে প্রায় মুখস্থই বললেন পুরো কবিতাটা।
বলে চললেন, দ্যাখো তো কী সুন্দর কবিতা!

তা সত্ত্বেও, শক্তি তার লেখাকে পদ্যই বলে গেছে।
অথচ তোমরা তরুণরা যা লিখছ
তাকেই কবিতা বলে দাও কী করে কে জানে!

উষ্ণতাজনিত রোগে শরীর শীতলও হয়ে পড়ে
কখনও সখনও, যতই রোদ্দুর হউক দুপুরবেলা
জোনাকি তবুজ্বলে, প্লেটোর মতন।
প্লেটোর বিনয় মজুমদারকে সক্রেটিস মনে হয়।
বিনয়দার নিজেকে মনে হয় 'বুদ্ধের গণিত' মনে হয়।

আলোর দিকেই যদি ছায়া পড়ছে বৃক্ষের, তবে
থেমে যেতে হয় সরু জলপ্রপাতের সামনেও
রাত্রির মাছির মতো শান্ত
বিনয়দা উপমা আবিষ্কার করে শিখালেন
একদা রাত্তিরে, বাইরে সামান্য বৃষ্টি হয়েছিল
শীত শীত রাত, নভেম্বর শেষ হবে হবে
বিনয় মজুমদারের ঘরে বসে আছে প্লেটো
বিনয়দা দোওয়ালের দিকে আঙুল তুললেন,
ছাদ থেকে ঝুলে আছে তিন হাত সুতলি একটা;
বিনয়দা সুতলিটাই দেখাচ্ছেন, অথচ আমি
দেখছি দেওয়াল, দেওয়ালে অনেক মুখ স্যাতঁসেতে দাগের কারণে।

বিনয়দা আজ্ঞার সুরে বললেন, ওই দড়ি দ্যাখ, ঝুলে আছে যেটা'
মাছিতে মাছিতে সরু সাদা সুতলিও মোটাকালো দড়ি হয়ে গেছে!
বিনয়দা ওদিকে আঙুল তুলে ওনার নিজস্ব সুরে বললেন,
'রাত্রির মাছির মতো শান্ত হয়ে রয়েছে বেদনা --
হাসপাতালের থেকে ফেরার সময়কার মনে।'

বিনয়দার কাছে জানতে চাইলাম
'বিনয়দা, বুদ্ধের গণিত কী?'
উনি চুপ , অনেকক্ষণ চুপ। তারপর বলতে লাগলেন
'হজরত মহম্মদ একজন ডাক্তার ছিলেন,
যীশু খ্রিস্ট একজন ডাক্তার ছিলেন,
তেমনি গৌতম বুদ্ধও সেই জন্মে ডাক্তারই ছিলেন।
এঁরা প্রত্যেকেই মানুষ ও সমাজের অসুখ সারানোর
চেষ্টা করে গেছে প্রাণপন।
অথচ সবাই এরাঁ বিশ্বের মালিক
অর্থাৎ সবাই এঁরা গণিত আবিষ্কারক।
এঁদের সবারই নিজস্ব গণিত আবিষ্কার করা আছে।
হজরত মহম্মদের গণিত, যীশু খ্রিস্টের গণিত, বুদ্ধের গণিত...'

তারপর চুপ, কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে
বলে উঠলেন'' অভিজ্ঞান আর জ্ঞানই ক্ষমতা;
গবেষণা করো, গবেষণা করো, নতুন নতুন
উপমা আবিষ্কার করো...'
বিনয় মজুমদার নিজেকে বুদ্ধের জাতক ভাবতেন।
কিন্তু প্লেটোর মনে হত বিনয় মজুমদারকে সক্রেটিস।
শায়ককে ইউবুলিডিস মনে হত।
মনে হত শায়ককে আক্রমনাত্মক।

প্লেটোর প্লেটত্ব আক্রমণাত্মক নয়।
টিকটিকের সামনে মাকড়াসা হোক
কিংবা মাকড়সার সামনে টিকটিকি...
যুদ্ধ অধরাই থেকে গেছে চিরকাল।

তবু মসনদে কোনও না কোনও ম্যাজিসিয়ান বসে
খেলা দ্যাখান পায়রা উড়িয়ে উড়িয়ে
পাথরের পায়রা উড়িয়ে মসনদে বসে
কীভাবে ঝরাতে হয় অশ্রুজল দেখাচ্ছেন তাও
আর পেয়ারার বদলে দুহাতে পাঁচটা লাড্ডুর খেলা দেখাচ্ছেন...
এবার ম্যাজিসিয়ান একজনের মুন্ডু আলাদা করে লাগিয়ে দেবেন
বলতেই ফের হাততালি;
উনি লাগাচ্ছেন, উনি লাগাচ্ছেন...

বোবা দর্শকের হাততালি বড়ই মধুর,
বোবা দর্শকের হাততালি হৃদয়ের আস্ফালন...
আমরা তো নিজেরাই নিজেদের নজর বন্ধ করে রেখেছিলাম
তবে কেন দোষারোপ করে যাচ্ছি পরস্পর,
একে অপরের দিকে তুলছি আঙুল?

ম্যাজিসিয়ান আঙুল তোলে না, সে খাঁড়া করে রাখে;
ইহাই প্রতীক, ইহাই শাসন...
প্লেটোর কলমও ইউবুলিডিসের বান্ধবীকে দেখে
উঠে গেছে, জেগে গেছে, ভাল হয় যদি বলি খাঁড়া
হয়ে গেছে শাসকের আঙুলের মতো

আঙুল আঙুল তুমি আরও লম্বা হও, মোটা হও, খাঁড়া হও আরও
তুমি কলমের মতো হয়ে ওঠো সোজা।
মোমবাতির শরীর বেয়ে গলিয়ে পড়ছে মোম,
শিখা তিরতির করে কাঁপছে নিশ্বাসে...

চূড়ান্ত ত্রুটির আঘাতে যে ফুল কি জন্মায়
আগুন জ্বালাতে হলে তাহাই যথেষ্ট;
প্রকৃত হৃদয় জানে, সত্যিটা আসলে মৌচাকের মতো
মধু পাওয়া যাক বা না যাক, হাত দিলে বোঝা যায়
সত্যি কতটা যন্ত্রণাদায়ক।

বিনয় মজুমদারের কবিতাঃ কিছু মৌন কিছু মুখরতা

ফাল্গুনী ভট্টাচার্য

''পৃথিবীর ঘাস, মাটি, মানুষ,পশু ও পাখি-সবার জীবনী লেখা হলে
আমার একার আর আলাদা জীবনী লেখা না হলেও চলে যেত বেশ...''

মহাপয়ারে বেঁধে এমন সদর্প উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন বিনয় মজুমদার। বাংলা কবিতার আবহমানধারায় যিনি আনতে পেরেছিলেন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চেতনার সমন্বয়। আর মনে প্রাণে নিসর্গ-পুষ্ট কবি নিসর্গের মধ্যেই সৃজনের লীলাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

অথচ সনাতন পাঠক তাঁর 'ফিরে এসো চাকা' কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন--''বাংলাদেশ কবিতার দেশ-- এটা নিতান্তই ছেঁদো কথা; যদি তাই হতো, তা হলে বিনয় মজুমদারকে বাংলাদেশের মাথায় করে রাখা উচিত ছিল।'' এই কথা লিখেছেন ১৯৭০ সালের ১৪ মার্চ 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যায়। তারপরে এতবছর পেরিয়ে এলাম, খুব কি বদল ঘটল আমাদের বিনয় কৌতুহলের? এই তো আমার হাতে এখন 'দে'জ প্রকাশিত 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস'- সম্পাদনা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (মার্চ ২০১১)। ৪৭০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে বিনয় মজুমদারের শুধু নামোল্লেখ রয়েছে দু'বার ১৭৪ ও ১৭৯ পৃষ্ঠায়। কোন আলোচনা কিন্তু নেই। দুঃখ জাগে বৈকি। সেদিক থেকে অগণিত লিটল ম্যাগাজিন বিনয় মজুমদারের সংখ্যা করে, পিতৃঋণ শোধ করার চেষ্টা করে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

বিনয় মজুমদারের কবিতার সঙ্গে যে বয়সে আমার অল্পবিস্তর পরিচয় হয়েছিল সে সময়টা আশির দশকের শেষ। সব কবিতা যে ভালো লেগেছিল তা নয়-- তবে একটি নতুন কণ্ঠস্বর শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। সেই কবিতাগুলোর চলনবলন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো নয়। আবার নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বা অরুণকুমার সরকারের মতো নয় সেদিন যে কবিতাটি পড়েছিলাম সেটি আজও একবার পড়ে নিতে চাই --

''ভালোবাসা দিতে পারি, তোমরা কি গ্রহণে সক্ষম?
লীলাময়ী করপুটে তোমাদের সবই ঝরে যায়
হাসি, জ্যোৎস্না, ব্যথা, স্মৃতি অবশিষ্ট কিছুই থাকে না।
এ আমার অভিজ্ঞতা। পারাবতগুলি জোৎস্নায়
কখনো ওড়ে না, তবু ভালবাসা দিতে পারি আমি।
শাশ্বত সহজতম এই দান-শুধু অঙ্কুরের
উদ্গমে বাধা না দেওয়া, নিষ্পেষিত অনালোকে রেখে

ফ্যাকাশে হলুদবর্ণ না করে শ্যামল হতে দেওয়া
এতই সহজ, তবু বেদনায় নিজ হাতে রাখি
বিনয় মজুমদার সম্ভাবনার আরো নতুন দরজা জানলাগুলোকে খুলে দিয়েছেন-
''অনেক কিছুই তবু বিশুদ্ধ গণিতশাস্ত্র নয়
লিখিত বিশ্লিষ্ট রূপে গণিতের অআকখময়
হয়না...''
তাহলে কবির মতে, জীবনে দরকার গণিতের নির্যাসের দর্শনটুকু। তিনি যেমন বলেন ০ (শূণ্য) থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি, এই ০ আবার এক অনন্ত অখন্ড অসীম পূর্ণ।
ধরা যাক ০+০=০
০-০=০
তা হলে উপনিষদের এই তত্ত্বও সমানভাবে প্রযোজ্য-
''পূর্ণমদ পূর্ণমিদ পূণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পুর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।''
(ওটি পূর্ণ, এটি পূর্ণ, পূর্ণ থেকে পূর্ণ উপচে পড়ছে। পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিয়ে নিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে)। আমি বিনয়ের শূন্য-তত্ত্বকে এইভাবে পড়ি। এই ভাবে প্রতেক পাঠক 'বিশ্বের মালিক' হতে পারেন। বিনয় তাই বলেছেন - ''কবিতা লিখলেই মানুষ, গণিত আবিষ্কার করলেই বিশ্বের মালিক''

তবু তাঁর যাপিত জীবনের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখছি জীবনের সব অঙ্ক মেলে না, মেলেনি। ব্যক্তি জীবনে কোথাও থিতু হতে না পারার বেদনা ও নৈরাশ্য তাঁকেও বারংবার জীবনানন্দের মতই গ্রাস করেছে, তবু তিনি পলায়নবাদী নন। বালকের মতো অভিমানে বলে উঠেছেন --
''হৃদয় নিঃশব্দে বাজো; তারকা কুসুম অঙ্গুরীয়
এদের কখনো আর সরব সঙ্গীত শোনাবো না।''

কখনো বলেন, 'আমাকে ডাকেনি কেউ নিরলস প্রেমের বিস্তারে' এই সব আত্মজৈবনিক খননপর্বে আমাদেরও চেতনার চোরকুঠরিতে ধাক্কা মারে এক অভিমানহত বালকের আর্ত চিৎকার। এক দেশ থেকে নতুন এক দেশে এসে শেষাবধি শিমুলপুরেই শিকড় ছড়িয়ে দেওয়া কবি লেখেন--
''এখন
আমি থাকি বঙ্গদেশে, আমাকেও মনে রেখো
বঙ্গদেশ তুমি।'' তখন কবির জীবনসম্পৃক্ততার ইঙ্গিতটি পাই। প্রকাশিত হয় দেশানুরাগের দেশ-রাগটির বিস্তার। কী কৌশলে কবিতা-সৃজন-প্রক্রিয়াটির সঙ্গে নরনারীর যৌনমিলনের পরমানন্দকে মিলিয়ে দিতে পেরেছেন তিনি।

''কবিতা সমাপ্ত হতে দাও নারী, ক্রমে ক্রমাগত
ছন্দিত, ঘর্ষণে দ্যাখো উত্তেজনা শীর্ষলাভ করে
আমাদের চিন্তাপাত, রসপাত ঘটে, শান্তি নামে
আড়ালে যেওনা যেন ঘুম পাড়াবার সাধ করে।''
একটি সৃজনও শিল্পসৌকর্যের চূড়া স্পর্শ করতে চায়, সেখানে তাঁর সার্থক তা-একেই তো শিল্প সমালোচনায় বলা হয় 'রস' একেই বলে 'ক্যাথারসিস'বা ভাবমোক্ষণ মিলনের রভস-আবেশের মতো শিল্পের 'পেনিট্রেশন', শিল্পীর নবজন্ম। এই যৌনতা-চিন্তা তাঁর ভুট্টা সিরিজের কবিতাগুলোতে আছে--'বসা শুরু করতেই...' বা ' আমি ঝুঁকে পড়ি আরো...' কবিতাতেও। এই সব কবিতা যুগপৎ নিন্দিত ও নন্দিত হয়েছে। তবু কয়েকটি কবিতার পুনঃপাঠে আমরা বুঝতে পারি, আসলে তিনি বোঝাতে চান অবদমিত যৌনকামনা থেকেই জন্ম, প্রসব ও একটি যন্ত্রনাজাত মোচন। কবির চিন্তনে মননে 'কেবলি কবোষ্ণ চিন্তা রস এসে চাপ দিতে থাকে' সে কারণে দরকার একটি কবির মোচনের,--যার ফলে
জন্ম নেয় একটি কবিতা, যা কবির হৃদয়-খোড়া ধন।

কবির যাপিত জীবনের ছায়া পড়েছে তাঁর কবিতার জলজদর্পণে। তিনি স্বীকারোক্তি দেন 'সময়ের সঙ্গে বাজি ধরে পরাস্ত হয়েছি'১৯৬১ তে লিখেছিলেন বিপুলবিথারি মনখারাপ নিয়ে--

''বেশ কিছুকাল হ'লো চলে গেছো; প্লাবনের মতো
একবার এসে ফের, চতুর্দিকে সরস পাতার
মাঝে থাকা শিরীষের বিশুস্ক ফলের মতো আমি
জীবনযাপন করি;''

কবিতার শরীরে এক মগ্নচারী কবি কোথাও কোথাও একটু আধটু মন খারাপ মিশিয়ে দিয়েছেন। দেখেছেন 'মানুষ নিকেট গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়'-- তাই কি তিনিও'বহুজনতার মাঝে অপূর্ব একা'?? অসুখ যখন পুরো শরীরকে গ্রাস করছে তখন কি খোঁজ করছেন বিশল্যকরণীর?
''রাত্রির মাছির মত শান্ত হয়ে রয়েছে বেদনা
হাসপাতালের থেকে ফেরার সময়কার মনে।
মাঝে মাঝে অগোচরে বালকের ঘুমের ভিতরে
প্রস্রাব করার মতো অস্থানে বেদনা ঝরে যাবে।''
জীবনকে ভালোবেসেছেন বলেই চলে যাবার সত্য মেনে নিয়েও একটি আশঙ্কা দানা বাঁধে মানে? তাই কি বলেন 'ভয় হয় একদিন পালকের মতো ঝরে যাবো'?

বিনয়ের কবিতার মধ্যে সমাজ ও দেশের ভাঙন অস্থিরতার কথা ততটা উচ্চকিত নয়। যাবতীয় অভিঘাত তাঁর নিজের ভিতরেই সমুদ্রলহরীর মতো ভেঙে পড়ে, আর কবিকে করে তোলে বেদনা-প্রহত। বিনয় মজুমদার কবিতার কলাকৌশল বা আঙ্গিক নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি রকমের সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি কবিতায় যে কিছু বলতে চান সেটিই মুখ্য, কেমন কের বলবেন তা তাঁর চিন্তার বিষয় নয়। তাই প্রথম পর্ব থেকেই আমরা দেখি আঙ্গিকের দিকে তিনি প্রচল বিরোধী

নন, পরম্পরাকেই স্বীকার করেছেন। সেই মিশ্রবৃত্ত আর সেই পয়ারের বাঁধুনি। শব্দ নিয়ে খেলা কোথাও কোথাও আছে। একটু ঝোঁক আছে তৎসম শব্দের দিকে। আমার মনে হয়, তিনি আঙ্গিকের বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না কবিতায় তাঁর সাধনাই ছিলো স্বতঃস্ফূর্তি আর স্বাচ্ছন্দ্যের। এ প্রসঙ্গে দু'জন সমালোচকের কথা মনে এলো, বুদ্ধদেব বসু আর সরোজ বন্দোপাধ্যায়ের কথা।

আঙ্গিক বা ভাষার এইসব কারিকুরি অনেক সময় পাঠককে ক্লান্ত করে। এই বাড়াবাড়ি প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছিলেনঃ''নতুন যারা লিখছেন আজকাল, তাঁরা অনেকেই দেখছি প্রথম থেকেই টেকনীক নিয়ে বড্ড বেশি ব্যস্ত, সেটা কোথা থেকে এসেছে তা আমি জানি, যথাসময়ে তা সমর্থনও করেছি, কিন্তু এখন সেটাকে দুর্লক্ষণ বলে মনে না করে পারি না... আমি এ কথা বলে কলাসিদ্ধির প্রাধান্য কমাতে চাচ্ছি না, কিন্তু কলাকৌশলকে পুরো পাওনা মিটিয়ে দেবার পরও এই কথাটি বলতে বাকি থাকে যে, কবিতা লেখা হয় স্বর ব্যঞ্জনের চাতুরী দেখাতে নয়, কিছু বলবার জন্য, আর সেই বক্তব্য যেখানে যত বড়ো যত স্বচ্ছন্দ তার প্রকাশ-প্রকরণ কৃতিত্বও সেখানেই ততবেশী পাওয়া যায়। মনে হয় বাংলা কবিতায় নতুন করে স্বাচ্ছন্দ্য সাধনার সময় এসেছে; প্রয়োজন হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তিকে ফিরে পাবার।''(রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক, প্রবন্ধ সংকলন, দে'জ, ১৯৬৬)

আমরা জানি প্রত্যেক কালান্তর বা বাঁকের মুখে কবিতা যে পালটে পালটে যায়, তার একটি বড় কারণ এই ভাষা বদল।

এই কালান্তর প্রসঙ্গে সরোজ বন্দোপাধ্যায় বলেছেন --''পালটে যায় কবিতার ভাষা, প্রসঙ্গ, প্রকরণ, শুধু কবির অভিনব হবার আকুলতাতেই নয়। আসলে পালটে যায় বলবার কথা। টেকনিকের নিজস্ব ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত সভ্যতারই জটিল-বন্ধুর অগ্রগতির ইতিহাস। সে অর্থে 'Every age is an age of transition'-- সে অর্থেই কালান্তরের চাপে কবির কাছে বদলে যায় কবিতার ভাষা।''

বর্তমানের যখন কবিতা পড়ি, তার ভাষা-ব্যবহারকে আমরা খুব যত্ন সহকারে দেখি। তার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ অর্থকে (Surface and deep structure of the language) আমরা যদি ঠিকঠাক দোহন করি তবে আমরা কবির অভিপ্রায় বুঝতে পারি।

সরোজ বন্দোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন - ''কাব্যের ভাষাই কবির অভিজ্ঞান। বাংলা কবিতার কালান্তরের পর্বে পর্বে এই সত্যটিই উপলব্ধ হল যে, নেহাৎ ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস এবং তার ব্যক্তিগত প্রকাশমাধ্যম-রূপ ভাষা কবির এবং কাব্যের দুর্বলতার নির্দশন। কবিকে সজাগ থাকতে হয়'ব্যক্তি সমাজের নিহিত ভাষা বিনিময়ের আততির' দিকে। কথ্যস্রোত বা কথ্যরীতি ইত্যাদি বিষয়কে সহজসুলভ অর্থে গ্রহণ করায় অবশ্যই বিপদ আছে, প্রত্যহের সজীব কথাস্রোতের ভিতর দিয়ে নিত্যের তটে পৌঁছানো প্রায় দুঃসহ সাধনা। আধুনিক বাংলা কবিকে পৃথিবীর অন্যদেশের সমসাময়িক কবিদের মতোই সেই সাধনায় রত থাকতে দেখে আমরা কাব্য পাঠকেরা উৎসাহিত থাকি। দেখি যে ভাষা গাঢ় হতে হতে সৃষ্ট হয় যে চিত্রকল্প, চিত্রকল্প স্বাধীন হয়ে চলে যায় যে প্রতীকের রাজ্যে-সে ভাষার আসল কাজ হল প্রতহ্যের উপাদান মাধ্যম ব্যবহার করেই প্রত্যহের জীর্ণ আবরণ সরিয়ে ফেলা। ভাষা নিয়ে এ অসাধ্য সাধন তিনি করতে পারেন, যিনি জীবনের স্থায়ী মূল্যগুলি সম্বন্ধে সচেতন। তাঁর কাছে কবিতা মানে সেই মূল্য সচেতনতা বা আত্ম-সচেতনতারই প্রগতি। সে প্রগতি একই সঙ্গে ব্যক্তিগত এবং মানবিক।''(বাংলা কবিতার কালান্তর)

এই কথাগুলি মনে পড়ে বিনয়ের কবিতার ভাষা প্রসঙ্গে। আমরা প্রথমেই বলেছি, তাঁর কবিতা জীবনানন্দের মতো নয়। আবার সুধীন দত্ত বা সমর সেনের মতো নয়। তিনি নিজের কাব্যভাষাকে ধীরে ধীরে শান-পান-পোড় দিয়ে গড়ে নিয়েছেন আর কবিতায় ভাষার'প্রতহ্যের জীর্ণ আবরণ সরিয়ে' দিয়েছেন। তাঁর কবিতায়'কেননা' 'কী প্রকার', 'প্রকৃত প্রস্তাবে' শব্দবন্ধ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের বা উপসংহৃতির মতো শোনায়। আবার দেখুন, চিন্তার পরিশীলন আর সংহত আবেগের পরিস্রবণে এই কবিতাটি কেমন কেলাসিত হয়ে উঠেছে--

''মুকুরে প্রতিফলিত সূর্যালোক স্বল্পকাল হাসে।
শিক্ষায়তনের কাছে হে নিশ্চল দেবদারু
জিহ্বার উপরে দ্রব লবণের মত কণা কণা
কী ছড়ায়, কে ছড়ায়; শোনো, কী অস্ফুট স্বর, শোনো
'কোথায়, কোথায় তুমি, কোথায় তোমার ডানা, শ্বেত পক্ষীমাতা

এই যে এখানে জন্ম। একি সেই জনশ্রত নীড় না মৃত্তিকা?
নীড় বা মৃত্তিকা পূর্ণ এ অস্বচ্ছ মৃত্যুময় হিমে...'''

তাঁর কবিতার উপমা উৎপ্রেক্ষা রূপক অন্যরকম। শব্দবন্ধ চিত্রকল্পে স্বাতন্ত্র্যলক্ষিত হয় --'উজ্জ্বল মাছ', 'সমস্ত জলীয় গান গান বাষ্পীভূত হয়ে যায়', 'উদগ্রীব মুষ্টি', 'বিপন্ন মরাল', 'সন্তপ্ত কুসুম', 'অসুস্থ বৃক্ষেরা', 'নিশ্চল স্নিগ্ধ দেবদারু', 'স্বল্পায়ু বিশ্রাম', 'প্রকৃত সারস' পায়রার মতো 'ক্ষমতাবতী পাখি', 'শীতল সাপের স্পর্শ', 'উত্তেজনা শীর্ষ লাভ করে কবিতার সমাপ্তি', 'মদের ফেনার মততো সাদা সাদা দাঁত', 'কৌটোর মাংসের প্রতিভা', 'হৃদয় বিস্মিত এক বিমর্ষ অসুখ', 'বেদনার গাঢ় রসে আপক্ক রক্তিম ফল', 'মিলনের শ্বাসরোধী কথা', 'মানুষ সমুদ্রকেই সবচেয়ে বেশি ভালবোসে'। এমনকি তাঁর দু'এক পঙক্তির কবিতাগুলিতে মাঝে মাঝে ঝলসে ওঠে প্রজ্ঞার আলোক--
১)'পাখিরা কী করে বোঝে ভোর হয়ে এসেছে এখন', ২)'সবচেয়ে ভালো জ্যামিতি ময়ূরের পেখমে',৩)'গাছ থেকে দেখে বোঝা যায় কোন জায়গা ভালো',৪)'শরীরের তুলনায় প্রজাপতির পাখনা কত বড়',৫) 'গর্ভবতী দেবীকে একজন দেবী বলা যায়না',৬)'অনেক গোলাপকে গোলাপ বলে চেনা কষ্ট' ইত্যাদি

আত্মপ্রচারের বিপ্রতীপে নিয়ত আত্মসঙ্কোচন আর আত্মগোপনের প্রয়াস আমাদের মুগ্ধ করে, কবিতায় নীরব-নিভৃতি-সাধনার শিক্ষা দেয়। আজকাল কী-বোর্ড ও তবলা সহযোগে যে সব আবৃত্তির আসর হয় তাঁর কবিতা সেখানে পড়ার জন্য নয়, পড়তে হয় মেধাবী ও সনিষ্ঠ অভিনিবেশের সঙ্গে।

কবির কাজ শেষ পর্যন্ত বোধ হয় বাচনাতীতকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। কবির ধর্ম অনন্তনৈঃশব্দের মধ্যে অযুতবাণীর প্রতিষ্ঠা দেওয়া। কবিতা হয়ে ওঠে বাঁচবার ঔষধ-যাবতীয় ক্ষত থেকে সেরে ওঠার বিশল্যকরণী।

আজকে যাঁরা কবিতা লিখতে আসছেন, বাংলা অক্ষরের নবান্ন-উৎসব শামিল হবার পাগলামি যাঁদের রক্তে, তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার সবিনয় নিবেদন, বিনয়ের কবিতা পড়ুন, আলোচনা ও তর্ক করুন, নতুন তাই-ই হবে আমাদের পরম্পরা ও ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি দেবার শুভ সূচনা।

পাঠক , আপনাকে প্রণাম।

১৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ শান্তিনিকেতনে বিনয় মজুমদার জন্মোৎসবে পঠিত রচনার পরিমার্জিত রূপ।

বিনয় মজুমদার তাঁর প্রিয় নারীর উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন--
''সেই কোন ভোরবেলা ইঁটের মতন চূর্ণ হয়ে
পড়ে আছি নানা স্থানে; কদাচিৎ যথেষ্ট ক্ষমতা;
তুমি এসে ছিন্ন ছিন্ন চিঠির মতন তুলে দিয়ে
কৌতূহল এক করে একবার পড়ে চলে যাও
যেন কোনো নিরুদ্দেশে, ইঁটের মতো ফেলে রেখে।'' এই খণ্ডচূর্ণ কবিসত্তাকে পাঠক জড়ো করে জুড়ে নিয়ে পড়বেন, তবেই গোটা কবিকে পাওয়া যাবে। কবি হয়তো সৃষ্টি করে নেপথ্যচারী হয়ে মৌন থাকেন, পাঠক তো মুখর হতেই পারেন তাঁর রচনার পাঠ পুনঃপাঠে।

বিনয় মজুমদারের সারাজীবনের কাব্য প্রয়াসের ফসল দেখে আমরা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার পঙক্তি দিয়ে বলতে পারি '' দুই মুঠি ভরে গেছে রজতকাঞ্চনে''। তাঁর কবিতার মোহবিস্তারী ভাষা, মহাজাগতিক বিস্ময়বোধ, বালকের মত আপাপবিদ্ধ মুগ্ধতা, গগনস্পর্শী প্রেম, বিকেলবেলার মরে আসার আলোর মত বিসণ্ণতা, ফসলহারানো মাঠের মতন একাকীত্ব, শীতরাত্রির কাঁপুনির মতো রোমাঞ্চ,

বি ন য় অ নু ভূ তি মা লা

পতঙ্গশিকারী

সুমন গুণ

ছন্দবিদ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় একবার জানিয়েছিলেন যে বাঙালির সহজাত আলস্যপ্রবণতার একটি জনপ্রিয় প্রকাশ জীবনানন্দের ছড়ানো অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। কথাটি অন্তত এইদিক থেকে ভাবাতে পারে যে একটি জাতির মনের ব্যাকারণ ধরতে চাওয়া হচ্ছে একজন কবির কবিতার প্রকরণ থেকে। আয়ত আর প্রকাশ্য এই ছন্দই, লক্ষণীয়, বিনয় মজুমদারেরও পছন্দ। এই প্রাকরণিক সখ্যই তাঁদের সংঘবদ্ধ করেছে।

কিন্তু শুধু এই ছন্দসান্নিধ্য নয়, বাংলা কবিতার এই দুই মহাপুরুষের ঘরানার মধ্যে একটি বৈষয়িক সম্বন্ধ আছে। আর সেই সখ্যের মূল সূত্রটি হল এই যে তাঁরা দুজনেই কবিতায় এক স্মিত দার্শনিকতাকে প্রশ্রয় দেন। জীবনানন্দের দর্শন ভেতরে জড়িয়ে রাখে সময়ের, ইতিহাসের ঘোর। আর বিনয়ও কথায় কথায় ঘটনার, বিজ্ঞানের, গণিতশাস্ত্রের নমুনা দেন। রবীন্দ্রনাথের পরে সময় ও সমাচার নিয়ে এমন অক্ষুণ্ণ মনস্কতা অন্য কোনও কবির লেখায় পাওয়া যায় না। শঙ্খ ঘোষ বা অলোকরঞ্জনের লেখায় দর্শনের মাত্রা অন্য, শঙ্খের মধ্যে এক বিশিষ্ট আদর্শের ধ্বনি থাকে, আর অলোকঞ্জন নিহিত ভাবুকের দীপ্তি নিয়ে তাকিয়ে থাকেন।

জীবনানন্দ এবং বিনয় কোনও ঘটনার বিবরণ দিয়ে থেমে যান না, সেই ঘটনা বা প্রসঙ্গের একটি সাধারণ নির্ণয় রচনা করেন। এমন একটি সূত্র, যা হয়তো এই সময়ের, সংসারের একটি সংজ্ঞার মতো।

'ফিরে এসো চাকা'র সেই সুখ্যাত কবিতাটিতে একটি উজ্জ্বল মাছের কথা নানাভাবে বলে শেষে বলা হল:
মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়

আরেকটি কবিতা: 'শিশুকালে শুনেছি যে'। কবিতাটি শুরু হয় এমন নিরুপদ্রব বর্ণনা দিয়ে:

শিশুকালে শুনেছি যে কতিপয় পতঙ্গশিকারী ফুল আছে,
অথচ তাদের আমি এত অনুসন্ধানেও এখনো দেখিনি

ইত্যাদি। কিন্তু কবিতাটি শুরু হচ্ছে এমন এক সুসমাচারে:
অতি অল্প পুস্তকেই ক্রোড়পত্র দেওয়া হয়ে থাকে।

আরেকটি কবিতা:স্রোতপৃষ্ঠে চূর্ণ চূর্ণ'। এই কবিতায় আছে এমন নতমুখ বিষণ্ণতা:

কেন ব্যথা পাও বলো পৃথিবীর বিয়োগে বিয়োগে?

তারপরেও, এক স্বাভাবিক তথ্য জানানোর ভঙ্গিতে:

বৃক্ষ ও প্রাণীরা মিলে বায়ুমণ্ডলকে সুস্থ, স্বাস্থ্যকর রাখে

কিন্তু তথ্যের সারাৎসার সূত্রাকারে না জানিয়ে তিনি স্বস্তি পান না। তাই তাঁকে জানাতেই হয়:-

প্রকরণ আর বিষয়ের সান্নিধ্য সত্ত্বেও, জীবনানন্দের সঙ্গে, এবং সেই সূত্রে তাঁর সময়ের অন্য সব কবির সঙ্গে বিনয়ের মৌল অমিল এইখানে যে, বিনয়ের সব উচ্চারণ একটি নিখুঁত লক্ষ্যের কাছে সমর্পিত। বিনয় কথা শুরুই করেন নির্দিষ্ট একটি প্রসঙ্গের গোড়া থেকে, তাকে পল্লবিত করেন, পত্রে-পুষ্পে ফলাবনত করে একবারে শেষে আকাশের উদ্দেশে শীর্ষমুখ করে ছেড়ে দেন। এই লক্ষ্যভেদী শব্দসন্ধান বাংলা সাহিত্যে এক অতুলনীয় অর্জন। জীবনানন্দের কবিতা চারপাশের সব উপকরণ ঝুলিতে তুলতে তুলতে এগিয়ে চলে, কিন্তু বিনয় এগোন ঘাড় হেঁট করে, বোধ হয় নিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে। এই ভঙ্গিটিই বিনয়ের স্বকণ্ঠে নিজের লেখা কবিতা পাঠে টের পেয়েছিলেন শঙ্খ ঘোষ। পড়তে পড়তে মাঝে মাঝেই থেমে যাচ্ছিলেন বিনয়, কোনও কোনও শব্দ পড়েছিলেন একাধিকবার, এমনভাবে, যেন নিজেকেই শোনাচ্ছেন তিনি।

একই সঙ্গে, বিনয়ের ভাষ্য আক্ষরিক অর্থেই ব্যক্তিগত। নিজেকে কেন্দ্র করেই তার বিস্তার। নানা সময়েই, নিজস্ব দিনলিপির ধরনে, কখনও একান্ত কথ্য ভঙ্গিতে কবিতায় কথা বলেছেন তিনি। 'বিশাল দুপুরবেলা' কবিতায় যেমন:

এবং অনেকবার ওই দূর চূড়াটিকে জিজ্ঞাসা করেছি, 'কেন সব মেঘ ধুয়ে দিয়ে গেলে, ধুয়ে দিয়ে চলে গেলে, যাবার পরেও কেন সব সবুজ রয়েছে, চূড়া, আসলে কমলা রঙের হবার কথা না?'

অক্ষরবৃত্তের চেনা ধরনেই পরিষ্কার কথা বলার তাজা রকমটি রাখতে পেরেছেন বিনয়। শেষ প্রশ্নটির কথ্য ঘনিষ্ঠতা বাংলা কবিতায় বিনয় মজুমদারের স্বাভাবিক উপহার।

জ্যোতির্ময় দত্ত একবার বিনয়ের একটি পংক্তিকে বলেছিলেন 'শিথিল ও দুষ্পাঠ্য'। পংক্তিটি হল:

'হাসপাতালের থেকে ফেরার সময়কার মনে'। কবিতাটি: 'দৃষ্টিবিভ্রমের মতো'।

দৃষ্টিবিভ্রমের মতো কাল্পনিক বলে মনে হয়
তোমাকে অস্তিত্বহীনা, অথবা হয়ত লুপ্ত, মৃত।
অথবা করেছ ত্যাগ, অবৈধ পুত্রের মতো, পথে।
জীবনের কথা ভাবি। ক্ষত সেরে গেল ত্বকে
পুনরায় কেশোদ্‌গম হবে না। বিমর্ষ ভাবনায়
রাত্রির মাছির মতো শান্ত হয়ে রয়েছে বেদনা
হাসপাতাল থেকে ফেরার সময়কার মনে।
মাঝে-মাঝে, অগোচরে বালকের ঘুমের ভিতরে
প্রস্রাব করার মতো অস্থানে বেদনা ঝরে যাবে।

এই কবিতার প্রথম দুই পংক্তিতে যে কাল্পনিক আলেখ্য রয়েছে, তা প্রায় পুরোটাই জীবনানন্দের নির্যাস। কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তিতেই একেবারে শেষে 'লুপ্ত'র পরে বিরতি দিয়ে 'মৃত' বলায় যে-তির্যক উচাটন, তা বিনয়েরই। এই চকিত বিপথ তৈরি করে নিয়ে বিনয় আমাদের সহজ অভ্যাসে যে-ধাক্কা দেন, তা-ই কবিতাটিকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে আসে। একই কথা বলা যায় পরের পংক্তিটি প্রসঙ্গেও। ঠিক আগেরটির মতো, এখানেও দুবার প্ররোচনাহীন হোঁচট, যা সম্পর্কের মধ্যে যে-বেদনা, তাকে ভাষা দেয়।

তারপর থেকে আবার, বিনয়ের ধরনের একটি উল্টোদিক কবিতাটিতে খুলে যেতে থাকে। 'জীবনের কথা ভাবি'. . . এই সদর্থক স্বীকৃতির প্রকরণটিই বিনয়ের শেষের দিকের দিনলিপিসম্মত কবিতার ধরনে এসে পৌঁছেছিল। 'হাসপাতালের থেকে ফেরার সময়কার মনে' পঙ্‌ক্তিটি এই ধরনের স্বচ্ছলতম উচ্চারণ। পঙ্‌ক্তিটির দুরূহ শৈথিল্যই চিনিয়ে দেয় কবির চারিত্র্য, জ্যোতির্ময় দত্ত তা বুঝেই কবিতাটির পড়ার পর বহুক্ষণ কৃতজ্ঞতায় ও বিস্ময়ে নীরব হয়ে বসে ছিলেন।

ওষুধের প্রয়োজন হলে উপপাদ্য নিয়ে বসি

কার্ত্তিক নাথ

জীবনের নানা সময়ে কতরকমভাবে কবি বিনয় মজুমদার-কে দেখেছি। চূড়ান্ত অবহেলা হয়তো তাঁর শেষ বয়সে পাওনা ছিল। এ অবহেলা বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পৌছে দিতে একবার 'আজকাল'-এ চিঠিও লিখেছি।

যৌবনে বহুবার গিয়েছি তাঁর কাছে। শুধু কি কবিতার জন্য? সহজে আপন করে নেওয়ার বীজ কোথায় যেন লুকানো ছিল তাঁর ব্যবহারে। এক অমোঘ টান এড়াতে পারিনি। ঠাকুরনগর স্টেশনে রেল লাইন পার হয়েই বিনয়দার বাড়ি--শিমুলপুর 'বিনোদিনী কুঠি'। দরজা বন্ধ। জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছি। আশ্চর্য নীরব দুটি চোখ অমলিন এক বাঁশি ব্যথার মতো বাজে। একটি পরিণত হত্যা। ধীরে ধীরে ভিজে যাচ্ছে বিছানা বালিশ রক্তস্রোত। অগণন কুসুমের দেশে শূন্য জলের গেলাস টেবিলে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। ভাঙা দেশলাই খাপ নীচে। বিড়ির পোড়া অংশ ইতস্তত ছড়ানো মেঝেয়। ভেতরে কবি আছে। পানপাত্র নেই। আলো নেই। জানলার ফাঁক দিয়ে আছে আকাশের সুদূরতা: এই সেদিনের কথা।

দুহাজার চার-এ একবার আমি, কবি সবুজবরণ বসু, সুকৃতি শিকদার, বিভাস রায়চৌধুরী, অভিনেতা অভয় চক্রবর্তী, শিল্পী ভাস্কর শীল গিয়েছিলাম বিনয়দার কাছে। সকালের দিকে গিয়েছিলাম। খুব কম কথা বলেছিলেন সারাক্ষণ। নিশ্চল যেন 'চাকা'র অধীশ্বর প্রতিবেশী ঈশ্বরকে দেখে? দেখে গোপাল ঈশ্বরের খাটাল। যেখানে ঈশ্বরই চতুষ্পদের মতো পড়ে আছে। আবেগে ভাসছি আর ডুবছি। ওষুধবিহীন এক অন্য বিনয়! এক বছর ওষুধ নেই! অদ্ভুত ভাবে বিনয়দা বলে ফেলেন, ওষুধের প্রয়োজন হলে উপপাদ্য নিয়ে বসি, জ্যামিতির উপপাদ্য। আবিষ্কারে ভালো থাকি।' এ কোন রহস্য! ওষুধের বিকল্প উপপাদ্য! মস্তিষ্কের কোষ জাগায় উপপাদ্য!

শান্ত ধীর বিনয়দা। লাবণ্য ছুঁয়ে আছে শুধু তাঁর সোনার কবিতা। শেষ হয়ে গেছে দেহের ফসল। ভেসে গেছে সব কোন দিকে অনামিকা নদীর মতো। সারা দিন ঘুরি শিমুলপুর--বিনোদিনী কুঠি--সুপারিবাগান-সবেদাতলা--বাতাবির বন--আমরা কয় কবিতাচোর।

অনেক আগে একবার গোবরডাঙ্গা কলেজে বি.এড-এর আবেদন পত্র জমা দিয়ে সোজা চলে এসেছি। দুপুর খাঁ খাঁ করছে। শিমুলপুরের আর সব মানুষের মতো বিনয়দা-ও দিবানিদ্রায়।
'বিনয়দা, ও বিনয়দা।'
লেপ মুড়ি দিয়ে পড়ে আছেন খাটের উপর। আমার নাক আর চোখদুটো তৎক্ষণাৎ ঢুকে গেছে জানলা দিয়ে। শুধু আমি দাঁড়িয়ে আছি জানলার শিক ধরে বাইরে। আমার ডাক শোনার সাথে সাথে লেপের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বেশ খানিকটা হেসে ফেললেন--

'আমি ঘুমাইনি'। ঘাড়ের ওপর থেকে লেপ সরিয়ে দরজা খুলে দিলেন। বললেন, ভালো হয়েছে তুমি বসো। আমি বাথরুম থেকে আসি। চলে যেও না যেন। আজ সকালেই তোমার কথা মনে করছিলাম।

বাথরুম থেকে সরাসরি আমার সামনে চলে এলেন। বললেন, ভালো হয়েছে। তারপর খাটের উপর বসলেন, আমি বললাম, আপনার এখানে জল আছে? সঙ্গে সঙ্গে খাট থেকে লাফিয়ে নামলেন।

হ্যাঁ আছে। আমি এনে দিচ্ছি জল। এক গেলাস। আমি এনে দিচ্ছি। -

- না আনতে হবে না। আমি খেয়ে আসছি।

-- আনতে হবে না মানে? আমি এনে দেবো।

বলার সাথে সাথে আঙুলগুলোর ভঙ্গিমাও অদ্ভুত করছিলেন। অনাদরে পড়ে থাকা একটা গেলাসে করে জল এনে দিলেন। তারপরে বললেন, আমি বেশ কিছু দিন গণিতে মন দিয়েছি। ভেবে দেখলাম গণিত চর্চা করা দরকার। এখনও বহু ফর্মুলা মুখস্থ রয়েছে। এই দেখো সারাদিন বসে বসে এই সব অঙ্ক করেছি। খুব ভালো লাগে। তোমরা Advance Differential Calculas পড়েছিলে তো?
--পড়িনি যে এমন নয়।
--Edward's advance Differential calculas ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে পাবে। খুব ভালো বই। খুব ভালো, খুব. . .

আমি বললাম, হুবহু এই নামের বই পড়িনি।

হাতে অংক কষা আছে এবং বেশকিছু কাগজপত্র ধরে আছেন। একই ভাবে কাগজ হাতে ধরে বেশ কিছু সময় নীরবতায় কাটিয়ে বিনয় দা বলে ওঠেন, হ্যাঁ। ভালো কথা। ordinary, 'Ordinary 3-dimensional interpolation formula' Bool- এর বইয়ে আছে। খুব ভালো বই। খুব। খুব। খুব ভালো তোমাদের Interpolation ছিল?

--হ্যাঁ। Numerical Analysis- এর মধ্যে ছিল। Interpolation -এর কথা শুনলে তো প্রথমেই Newton-এর কথা মনে এসে যায়।

পৃষ্ঠাগুলো উল্টাতে উল্টাতে আমাকে বোঝাতে থাকেন, ধরো, একটা function ie y = f (x,z), এটাকে নির্দিষ্ট করেই ধরো, y = f (x,z) = SinSinz. এই function-কে এই দেখো, এই formula- এর সাহায্যে, চারটে বিন্দু নিয়েছি। চারটে বিন্দুতে Interpolation করলে চারটে Surface পাওয়া যাচ্ছে। এই চারটে Surface একত্রিত করলে একটি Smooth surface হচ্ছে, যে চারটে Surface এই Surface-এরই চারটি অংশ কী অদ্ভুত ব্যাপার দেখো।

সব বিষয় গুলো একাধিক formula-র সাহায্যে খুব ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন বিনয়দা। বোঝানোর মাঝে মাঝে হাতে তুড়ি মারেন। আঙুলের ভঙ্গিমা রামকৃষ্ণের মতো। মুখের ভঙ্গি শিশুর মতো বিকৃত, অদ্ভুত রকম। হঠাৎ হঠাৎ নীরব থাকেন। তারপর এমন সব কথা বলেন যার সাহায্যে ওই নীরব থাকার অর্থ পরিষ্কার হয় না। এসব দেখে আমার ভাবনা গড়িয়ে গড়িয়ে যায় বিনয়দাকে নিয়ে।

বিভিন্ন formula-র সাহায্যে Higher mathemetics-এর যে সমস্ত সমস্যাগুলো কষে আমার সাথে আলোচনা করছিলেন। সেগুলোর সব এখানে ছাপা অক্ষরে হাজির করা সম্ভব হল না। এর জন্য দীনতা-ই দায়ী।
সেগুলো এখানে ছাপার অক্ষরে হাজির না করলে গণিত বিষয়ে বক্তব্য স্পষ্ট হয় না ঠিকই। তবে বক্তব্যটা এই জন্যই যে, একজন কবি যিনি 'বিনয় মজুমদারের শ্রেষ্ঠ কবিতা', ' নক্ষত্রের আলোয়', 'ঈশ্বরীর', 'অধিকন্তু', 'অঘ্রাণের অনুভূতি মালা', 'বাল্মীকির কবিতা'র মতো কাব্যগ্রন্থ, এক কথায় সব মিলিয়ে পনেরো হাজার কবিতার (তাঁর হিসাব মতো) স্রষ্টা, তিনি জীবনের শেষের দিকে এসে আবার গণিত নিয়ে মেতেছেন। কাছে বই নেই। শুধু সাদা কাগজের পাতা আছে। স্মৃতি থেকে টেনে এই গণিতের অনেক সমস্যার সমাধান করছেন দিনের পর দিন। সমস্যা হয়েছে আমার। একটু যাই সাহিত্য নিয়ে কথাবার্তা বলতে। উনি হাজির করেন গণিতের পৃষ্ঠা। আমি গণিতের। অতএব গণিত নিয়ে আলোচনা করা যাবে আমার সাথে।

--কার্তিক, তুমি দুপুরের দিকে চলে আসবে। আমি একা একা থাকি। জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।

-- আমি আসি কবিতা শুনতে। কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে। আপনি হাজির করেন গণিত। ভাল্লাগে না।

চোখ নাচিয়ে বিনয়দা বলেন, আরে গণিত খুব ভালো। বিনয়দা ভীষণ হেসে ফেলেন। বলেন, আমার, গণিতের ফর্মুলাগুলো সব বহুদিন পর মনে এসে যাচ্ছে-- খুব ভালো লাগছে। সারাদিন বসে বসে কষছি।

অদ্ভুত শক্তি আর ধৈর্য। y=f (x,z)=Sinx Sinz functionকে Expand করে তাঁর বিভিন্ন order- র Partial derivative - এর মানে বসাচ্ছেন। সে একটা আধটা মান না। আর শুধু একটা point-এ value বের করছেন। এই মানগুলো বসিয়ে পরীক্ষা করছেন series-টা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। ওই series, convergent series না, diversent series না, oscillate করছে তাও লক্ষ করছেন অনেকগুলো Term পর্যন্ত মান বসিয়ে। আমরা হলে বলতাম, ধেৎতেরিকা এত করতে ভাল্লাগছে না।

বেশ কিছু সময় কথা নেই। নীরব। চোখ দুটো জানলা দিয়ে বাইরের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছেন বিনয়দা-- কবি বিনয় মজুমদার। তারপর আঙুল নাড়িয়ে বললেন, circle-এর Circucumfereina diameter এর ratio (Constant)-- ধ্রুবক। তোমরা ছেলেদের π—এর মান কত ধরে পড়াও? 22/7 তো?

আমি বললাম হ্যাঁ। ওই বিদঘুটে মানটা ওদের সামনে তুলে ধরলে ওরা তো ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাবে। তাই 22-ই ধরা হয়।

বিনয় দা বললেন, কিন্তু কথা হচ্ছে এই π-এর মান। অর্থাৎ ওই ratio। ওই circumference ও diameter এর Ratio-এটা কি ধ্রুবক

আমার তো মনে হয় না। কারণ, constant কাকে বলব? যার কোনো পরিবর্তন হবে না, একই থাকবে। তাহলে এবার দেখো π-এর মান গিয়ে দাড়াচ্ছে 3.1415927... এখানে কি সঠিক কিছু পাচ্ছি? দশমিকের পর অংক বেড়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে যাচ্ছে যাচ্ছে যাচ্ছে যাচ্ছে। তাহলে? আমি বললাম, আসলে, আপনি যা বলছেন যেটা অযৌক্তিক নয়। আমার মনে হয়, circle- ;এর circumference ও diameter-এর Ratio কে constant বলছেন এই অর্থে যে, ওই মানটা যে মানই হোক নাকেন তা সব circle-এর ক্ষেত্রে একই থাকবে অতএব সবার ক্ষেত্রে যদি একই হয় তাহলে তাকে constant বলতে আপত্তি নেই।

--কিন্তু যে মানটা নির্দিষ্টই না, সেটাকে ধ্রুবক বলি কি করে? বিনয়দা বললেন,
--আপনার কথা মতো তাহলে তো সমস্ত আবৃত্ত দশমিকের সংখ্যাগুলি variable
--হ্যাঁ--অ্যা--অ্যা...
আমি বললাম, আর একটা বিষয় লক্ষ করুন, constant× constant=constant, constant×constant=constant সুতরাং 22/7 constant কারণ, 22= constant, 7= constant কিন্তু আপনার কথামতো 22/7 variable.

--constant×constant=constant এগুলোতো axioms. আসলে গোড়ায় একটা কী ঝামেলা হয়ে আছে। মাথাটা একটু ঝাড়া দিয়ে বলে উঠলেন বিনয়দা।

--আসলে ব্যপারটা একটু গোলমেলে মনে হচ্ছে। আমি যোগ করলাম।

-- হ্যাঁ-- অ্যাঁ-- অ্যাঁ...অ্যাঁ... গোলমেলে। আমার বাবা যেদিন মারা যান, সেদিন আমার এই বিষয়টা মনে হয়েছিল। আজ আবার মনে হচ্ছে। বিষয়টা একটু ভাবা দরকার। তুমি যেটা বললে: সব বৃত্তের ক্ষেত্রে এক বলে ওই অর্থে ওটাকে ধ্রুবক বলছে। তোমার কথাটা বুঝতে পেরেছি আমি। কিন্তু যার কোনও নির্দিষ্ট মান পাওয়া যাবে না তাকে ধ্রুবক বলি কী করে। আমি এসব নিয়ে এখন ভাবছি।

আমি বললাম, দেখুন, একটা circle এর circumference - ও একটা দৈর্ঘ্য, diameter-ও একটা দৈর্ঘ্য। একটা দৈর্ঘ্যকে একটা দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করলে যতটুকু পাই না কেন, তা নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। অথচ নির্দিষ্ট কিছু পাচ্ছি না।

--বুঝলে কার্তিক, আমার মনে হয় π-এর মানের দশমিকের পর অংশগুলো আছে তা একটা জায়গায় গিয়ে থেমে যাবে, যদি আমরা অনবরত ভাগ করে যাই, যাই যাই যাই

-- নাও থামতে পারে। না হলে আবৃত্ত দশমিকের ব্যপারটা আসত না। এখন অনেক সংখ্যাই আছে যাদের সঠিক মান পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি কবিতা শোনাবেন না?

--আবার কবিতা শুনবে?

--সে কি? গুরুগৃহে এলাম। গুরুর মন্ত্রোচ্চারণ শুনব না তা কি হয়?

আমার কথা শুনে বেশ খানিকটা হাসি এসে তার অবাধ্য দাড়ির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সে হাসির রেশ বেশ খানিকক্ষণ আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আটকে যায়। কবিতা শুনি কবির কণ্ঠে:

বেশ কিছু কাল হল চলে গেছ, প্লাবনের মতো
একবার এসে ফের; চতুর্দিকে সরস পাতার
মাঝে থাকা শিরীষের বিশুষ্ক ফলের মতো
জীবন যাপন করি; কদাচিৎ কখনো পুরোনো
দেয়ালে তাকালে বহু বিশৃঙ্খল রেখা থেকে কোনো
মানুষীর আকৃতির মতো তুমি দেখা দিয়েছিলে
পালিত পায়রাদের হাঁটা, ওড়া, কূজনের মতো
তোমাকে বেসেছি ভালো; তুমি পুনরায় চলে গেছো

ঝম্ করে বিদ্যুৎ চলে যায়। একটা গাঢ় অন্ধকার নিঃসঙ্গ কবিকে গিলে ফেলে। দরজার পাশ থেকে একটা বিড়াল মিউ করে ডেকে ওঠে। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে শিমুলপুর ছেড়ে ঘন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে স্টেশনের দিকে আসি।

বি ন য় অ নু ভূ তি মা লা

‘বিশ্বের বালকটিকে দেখে’

পার্থজিৎ চন্দ

বিনয় মজুমদারকে নিয়ে কিছু অক্ষম অক্ষর লেখবার শুরুতে আমি আমার চব্বিশ বছর বয়সের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখি একবার। দেখি আর ভয়ার্ত হয়ে পড়ি। দেখতে পাই চব্বিশ বছরের এক যুবক ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে স্থবির এক পৃথিবীর দিকে। নাহ্, কোনও বাহ্যিক কারণ ছিল না এই তলিয়ে যাবার। যেটা ছিল সেটা হল একধরণের অবসেসিভ ডিস-অর্ডার। সেই যুবক তখন তীব্র ভাবে বিশ্বাস করে, মাংসের গন্ধভরা এই পৃথিবীতে যে কোনও সৎ ও প্রকৃত সৃষ্টির জন্য চাই এই ধরণের দিব্য-উন্মাদনার প্ররোচনা।

আমাকে গ্রাস করে নিয়েছিল সেই প্রায়-মনোবিকলন। আর তার কেন্দ্রে ছিলেন বিনয় মজুমদার। অনেকেই পঞ্চাশের কবিদের বিখ্যাত বোহেমিয়ানিজমের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিশ্চয় একদিন ভেবে নিয়েছিলেন যে, মধ্যরাতের কলকাতার ফুটপাত শাসন করবার মধ্য দিয়েই কবিতার যজ্ঞভূমি প্রস্তুত হয় ধীরে ধীরে। আমার জীবনের বিশেষ পর্বটিতে বিনয় অনেকটা সেই ভূমিকা পালন করে গেছেন। গ্রাস করেছিলেন কলসপত্রের মতো।

কিন্তু একটা সময়ের পর বুঝেও গেছিলাম যে এইভাবে বিনয়ের কবিতা আর তার যাপনকে বিন্দুমাত্র ছোঁয়া যায় না। এই ভাবে আক্রান্ত হবার পর একটা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। আমারা চতুর হয়ে উঠি ক্রমশ। বুঝতে পারি এই ভয়াবহ জীবন আমাদের জন্য নয়। কবিতার কাছ থেকে, বলা ভালো কবিতা লিখে আমাদের বেশ কিছু জিনিস পাবার আছে। লোভাতুর চোখে চেয়ে থাকি কাব্যলক্ষ্মীর দিকে। আমরা পরিত্যাগ করি সেই পথ। হাঁফ ছেঁড়ে বাঁচি সেই অসম্ভব বেদনার ভারকে...সেই মহাজাগতিক ঘোরকে...মাথা থেকে নামিয়ে। যেন ভোররাতে আমাদের দিকে ছুটে আসা যে প্রত্ন-স্বপ্ন, তাঁকে সফল হতে-না-দিয়ে তৃপ্তিও পাই কিছুটা। আর এর পর থেকেই নির্জনে, নিজের কাছে বিনয় আমাদের কাছে ভয়ংকর অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠেন। লেডি ম্যাকবেথ ডানকানকে হত্যা করতে গিয়েও পারেনি। ঘুমন্ত ডানকানের মুখে সে দেখতে পেয়েছিল তার মৃত পিতার মুখ। আমাদের স্বপ্নেও কিছুটা সেই ভাবেই ফিরে ফিরে আসেন বিনয়। কবিতাকে পণ্য

করে আমাদের যত প্রাপ্তি, আমাদের জ্ঞাতসারে যে দুষ্ট-সরস্বতীর আরাধনা, আমাদের যত গুপ্ত কৌশল, কবিতার নামে গুপ্তহত্যার আরাধনা... সব কিছুর আড়ালে জেগে থাকে বিনয়ের ঘুমন্ত মুখ। প্রতিটি তরুণ কবি, যখনই সে জ্ঞাতসারে কবিতার থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে কবিতার সঙ্গেই প্রতারণার খেলায় মেতে ওঠে, তখন তার বুকের ভেতরে যে দংশন জেগে ওঠে তারই নাম বিনয় মজুমদার।

অনেকদিন পর বিনয়ের একটি ছবি দেখে আমার আরও একটা কথা মনে হয়েছিল। খালি গায়ে লণ্ঠন নিয়ে রাতের অন্ধকারে হেঁটে যাচ্ছেন বিনয় মজুমদার। কিছুটা ঝুঁকে পড়েছেন সামনের দিকে। যেন এক স্নেহশীল প্রপিতামহ বাংলা কবিতায় তাঁর পৌত্র-পৌত্রীদের লণ্ঠনের মায়াবী আলোয় পথ দেখাবার চেষ্টা করছেন। কবিতায় মহা বিশ্বকে চেনাতে চেয়ে বলতে চাইছেন, এই দ্যাখো, এই হল বাংলা কবিতা। সব ইকেবানা, বার্বি-ডল, কানঝোলা কুকুর, নিউ মার্কেটের বিষণ্ণতা, দোতলা বাসের জানালা আর বাংলার জনপদ জনপদে ইউরোপিয়ান তুষারপাতের বাইরে এই হ'ল বাংলার কবিতার প্রকৃত ভুবন।

মেধা-সর্বস্ব কিন্তু আবেগহীন এবং আবেগ-সর্বস্ব কিন্তু মেধাহীন... এই দুই হারামিশিল্পের থেকে কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে নিজেকে স্থাপন করেছেন বিনয়।

বিনয়ের মিস্টিসিজম, দুর্বোধ্যতা ইত্যাদি নিয়ে যারা ওকালতি করেন তাদের আত্মা শান্তি পাক। কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার যে বিনয় মোটেই নিছক মেধাচর্চার ক্ষেত্র করে তোলেননি তাঁর কবিতাকে। এই প্রসঙ্গে বিনয়ের কয়েকটি কবিতার উদ্ধৃতি দিলেই ব্যাপারটি বোঝা যেতে পারে। সেই উদাহরণের দিকে কিছুটা পরে চোখ ফেরানো যাবে। শুধু এটাই বলার যে, পৃথিবীর সব বড় সৃষ্টিই আদপে সহজের নির্মাণ। রবীন্দ্রনাথের গান ভ্যান গগের ছবি নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার। এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে ম্যাজিক প্যাটর্ন তা হয়তো খুবই সরল-সহজ। শুধু আমাদের যে মাত্রায় বিচরণ, এই সব সৃষ্টি সেই মাত্রাগুলির বাইরে অবস্থিত। বিনয়ের মতো কেউ কেউ খুঁজে পান রহস্যের সন্ধান।

আধুনিক বাঙালির জীবন ও কবিতা থেকে বিজ্ঞানের ছায়া প্রায় মুছেই গেছে। ইনফরমেশন ও মেধাশাসিত প্রজ্ঞার দিক থেকে বাংলা কবিতার মুখ ফেরানো শুরু হয় পঞ্চাশের দিনগুলো থেকেই। জীবনানন্দের কবিতা ও প্রবন্ধের পাঠ আমাদের বিন্দুমাত্র ধারণা দেয় না যে মাত্র দুটি দশকের ব্যবধানে বাংলা কবিতা থেকে এই ব্যাপারটি প্রায় মুছেই যাবে। একাদেমিক বা নন-একাদেমিক বিজ্ঞানচর্চার ফলে লব্ধ প্রজ্ঞাকে কবিতার শরীরে ঢেলে দিয়ে শিশুর সারল্যে প্রকৃতির-যৌনতার- বিরহের ও এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জীবনের ট্রাজেডিকে বুঝে নেবার মধ্যেও যে অনন্ত কুহক লুকিয়ে থাকতে পারে সেটাই ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করে বাংলা কবিতা। অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই সময়টাতে অনেক বেশী অটোমেটিক রাইটিঙের দিকে ঝুঁকে পড়ে বাংলা কবিতার জনপ্রিয় মূল ধারাটি। এই ধারার বিপ্রতীপে যে কেউ কেউ ছিলেন না, তা নয়। কিন্তু ব্যতিক্রম ঠিক সেই ভাবে নিয়মকে প্রতিষ্ঠা করে না।

এই ধারাটিকে, আজ এতদিন পর নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে মনে হয়, ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন বিনয়। আবেগশাসিত মেধাও যে কবিতাকে কী বিপুল রাজকীয় প্রভা প্রদান করতে পারে বিনয়ের কবিতার দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যায়।

কিন্তু কী আছে বিনয়ের কবিতায়?

বিনয়ের কবিতায় আছে নিজেকে গুপ্তহত্যা করতে করতে এক কবির লিখে যাওয়া অক্ষরমালা। আর আছে পাঠকের সামনে মহাজাগতিক রহস্যমালা খুলে যাবার সুস্পষ্ট ইশারা। যাবতীয় জটিলতার শেষে বিনয়ের কবিতায় ছেয়ে থাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ-সঞ্জাত এক চূড়ান্ত সহজ ও সরল উপলব্ধি। এই আবিষ্কারের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় অনেক সময়েই।

'ফিরে এসো চাকা'র প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই ছায়া ফেলে রাখে এই আপাত-জটিল, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সহজ সেই পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি। 'মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়' মিথ হয়ে গেছে। একই ভাবে মিথ হয়ে গেছে 'অথচ পায়রা ছাড়া অন্য কোনো ওড়ার ক্ষমতাবতী পাখি/ বর্তমান যুগে আর মানুষের নিকটে আসেনা না

কিন্তু বাংলা কবিতার সামান্য একজন পাঠক হিসাবে আমার বারবার মনে হয়, সাধারণ পাঠকের কথা বলাইবাহুল্য, এই সময়ের বাংলাকবিতার অনেক তরুণ অক্ষরজীবীও বিনয়ের 'ফিরে এসো চাকা' পরবর্তী কবিতার প্রতি সমান ভাবে মনোযোগী নয়। ফিরে এসো চাকা-কে ঘিরে গড়ে উঠেছে নানা মিথ। এই মিথ প্রকারান্তরে একজন লেখকের ক্ষতিই করে শেষ পর্যন্ত। এই মিথ কিছু মানুষকে একটি কাব্যগ্রন্থের দিকে টেনে নিয়ে আসে মাত্র। সেটাই হয়েছিল বিনয়ের ক্ষেত্রেও। কিন্তু বাংলা কবিতার সবথেকে বড় অভিশাপের মধ্যে এটাও একটা যে, ফিরে এসো চাকার বাইরে ছড়িয়ে থাকা বিনয়ের বিপুল ও অসামান্য লেখাগুলি একটু যেন আড়ালেই থেকে গেল। বাংলা কবিতার পাঠকেরা ঘুরে মরলেন ফিরে এসো চাকার মধ্যেই। তরুণ কবির দল আবার ফিরে গেল নাগরিক বিষণ্ণতার ছায়ামাখা কবিতার দিকেই। আবার বাংলা কবিতায় শুরু হয়ে গেল হিমযুগের প্রস্তুতি।

বাংলা কবিতার পাঠক আর নিয়ন্ত্রকদের কি চোখ এড়িয়ে গেছে বিনয়ের এই লেখা,
'কাপড়ের অন্তরালে মানুষ বিলীন হয়ে যায়

মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তারপর আবার গজায়
রোমশ মৃত্তিকা থেকে। মাটির ভিতরে প্রথমেই
থাকে তার অগ্রভাগ কাণ্ডের একাংশ সরু হয়ে।
সেই কাণ্ড মোটা হয় দৃঢ় হয়; নিশ্চিহ্ন হয় মানুষ
এভাবে গজিয়ে ওঠে; দেখা দেয় ক্রমে ক্রমে সব--
সপত্র নিতম্ব পেট মাথা বুক, হাওয়ায় হাওয়ায়
দোলে আর বেড়ে ওঠে বেড়ে বেড়ে পূর্ণ রূপ পায়।' (কাপড়ের অন্তরালে)

এখনও বাংলা কবিতার পাঠকদের যদি স্তম্ভিত হবার যথেষ্ট কারণ না ঘটে থাকে তাহলে বিনয়ের আরেকটি কবিতার কিছুটা তুলে ধরা যাক,
'তৃতীয়ার চাঁদ ডুবে চলে গেল নারিকেল গাছের পিছনে
যে সময়ে চাঁদ ওঠে আমি জোছনায় বসে থাকি, জোছনায় শুয়ে থাকি;
কারণ শরীরে জোছনা লাগলে আমার খুব উপকার হয়।' (সূর্যের চেয়েও বড়)

এই অতি সরল কনফেশনের আগে কিন্তু বিনয়ের জানানো হয়ে গেছে যে সূর্যের চেয়েও বড় তারা আছে। তারা অনেক দূরের বলেই তাদের ছোট বলে মনে হয়। কিন্তু বিনয়ের কবিতার আসল রহস্য ও ব্ল্যাকহোলের-মতো টান লুকিয়ে ঐ উচ্চারণের মধ্যেই, 'কারণ শরীরে জোছনা লাগলে আমার খুব উপকার হয়।' ঠিক কী উপকার সেটা বললেন না বিনয়। কিন্তু পাঠককে টেনে নিয়ে গেলেন এক মহাজগতের দিকে। পৃথিবীর মাটিতে শুয়ে থাকা এক কবির গায়ে নেমে আসছে মহাজাগতিক জ্যোৎস্না। নক্ষত্রের ধুলো লেগে আছে আমাদের গায়ে। কোটি কোটি বছর আবার যেন এক সংযোগসূত্রে বাঁধা পড়ে যাচ্ছি আমরা।

হায় রে, যে হারামি- শিল্পের পুজো করে গেল বাংলা কবিতার একটা বড় অংশ, তারা কি পড়েছে,

'আরো এই সব গাছ পবিত্র বিশুদ্ধ রাখে আবহাওয়া, স্বাস্থ্যকর রাখে।
যে সব গাছের ফল পৃথিবীর মানুষেরা খাই সেই সব গাছ অমর,
শাশ্বত।
জীবনযাপনকালে এই সব গাছপালা আমি মনে রেখেছি এবং
দূর-বহুদূর থেকে এই সব গাছ দেখে মনুষ্যবসতি চেনা যায়।'
(আমাদের গ্রাম)

কবিতাটিতে অবিস্মরণীয় স্টেটমেন্ট আছে কিছু। আছে প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীর মতো পর্যবেক্ষণ। কিন্তু তার থেকে বেশী আছে কবিতার শরীরে মিশে থাকা প্রজ্ঞা। গাছ আবহাওয়া বিশুদ্ধ রাখে, আমাদের জানা হয়ে গেছে। কিন্তু যে গাছের ফল পৃথিবীর মানুষেরা খায়, সেই গাছ অমরতা পেয়ে যায়! মাথার ভেতরে স্নায়ুগুলি ঝমঝম করে ওঠে। গাছ ফল উপহার দিচ্ছে মানুষকে। সেই ফল মানুষকে আয়ু প্রদান করেছে। সেই আয়ু, সেই শুক্র মানুষকে প্রদান করছে সন্তান। মানে অনন্ত জিনের প্রবাহ। প্রাণের প্রবাহ। সেই শুক্রের মধ্যে, সেই প্রাণের মধ্যে, সেই আয়ুর মধ্যে মিশে যাচ্ছে গাছের উপহার দেওয়া ফল।
এর পরেও কবিতাটিতে একটি উড়ান আছে। প্রথম উড়ানেই কবিতাটি শেষ হয়ে গেলে সেটি একটি ভালো কবিতা হয়ে উঠতো। এরপর বিনয় লিখলেন, 'দূর-বহুদূর থেকে এই সব গাছ দেখে মনুষ্যবসতি চেনা যায়।' বিনয় লিখছিলেন 'জীবনের কথা ভাবি, ক্ষত সেরে গেলে ত্বকে/ পুনরায় কেশোদ্গম হবে না;'। জ্যোতির্ময় দত্তের মত সমালোচক বিস্মিত হয়ে ভেবেছিলেন, এই অতি চেনা সহজ সত্যটি আমাদের চোখের ও বোধের আড়ালে ঢাকা পড়েছিল এতদিন। বিনয় চিনিয়ে দিলেন সেই সত্যটিকে। এখানেও আমাদের স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। বৃক্ষের সাম্রাজ্য শেষ হয়ে গেছে বহুদিন। মানুষের নিষ্ঠুর হাত গাছের শরীর কেটে ফেলে। তবু দিনের পর দিন মানুষের বসতির কাছেই গাছ তার ছায়া ফেলে রাখে। গাছ ঘিরে রাখে মানুষের সন্তানকে। আর বহুদূর থেকে দেখলে চোখে পড়ে বৃক্ষ-ঘেরা সেই সব মনুষ্যবসতি। এবং দূর ও বহুদূরের মধ্যে ঐ যে এইটি অমোঘ ড্যাশ, সেখানে ঝরে পড়ে এক প্রজ্ঞাবান ঐশীপ্রাপ্ত ভারতীয় ঋষির অশ্রু। ঠিক এরকম শত শত-- তুলনায় স্বল্পপঠিত-- আশ্চর্য সব কবিতা রয়ে গেছে বিনয়ের। গ্রন্থিতেই পাওয়াও তেমন কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু বাংলা কবিতার অভিশাপ, সেই কবিতার দিক থেকে ঈষৎ মুখ ফিরিয়েই রয়ে গেল বাংলা কবিতার তরুণতম প্রজন্ম। তারা হয়তো জানলোই না যে দূরতম নক্ষত্রের বিরল-প্রভা নিয়ে বেদনায় নীল এই কবিই লিখে রেখে গেছেন --

'সারাটা জীবন আমি বিশ্বকে দেখেছি যত দেখা যেতে পারে
আকাশে প্রথম তারা যেটি দেখা যায় সেটি তারা নয় গ্রহ সেটি
অগ্নিহীন সুশীতল গ্রহ--'(বিশ্বের ভেতরে)

বিনয়ের শেষ দিকে লেখা কবিতাগুলি হয়তো সেই উচ্চতায় পৌঁছায়নি। দিব্যোন্মাদ ঋষির কাছে ক্রমশ মুছে গিয়েছিল আমাদের পৃথিবীর ডায়মেনশনগুলি। ফলে কবিতায় যে হয়ে ওঠা, সেটিই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছিল তাঁর কাছে। শহরের ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা মানুষের হঠাৎ মনে হয়েছিল বড় বেশি ভালো কবিতা দিনের পর দিন লিখে গেছেন বাংলা কবিতার ঐশীপ্রাপ্ত কবি বিনয়। এই সময়ের কিছু আখ্যান ও কিছু তথ্য থেকে জানা যায় যে ঠিক কীভাবে সেই সব থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন বিনয়। আমার বারবার এটা মনে হয়, বিনয়ের যে অক্রমিক আচরণ, সেটি তৈরি করা না হলেও, এক ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তো বটেই। প্রকৃতি বিনয়কে এই কবচকুণ্ডল দিয়ে পাঠিয়েছিল। সেই কবচকুণ্ডলকে আজীবন রক্ষা করে ছিলেন বিনয়। সচেতনভাবেই, কবিতার জন্য নিজের চারদিকে গড়ে তুলেছিলেন এক দুর্গ। কেটে রেখেছিলেন এক পরিখা।

এই মহাজাগতিক বোধ, প্রজ্ঞা আর নিবিড় ভালোবাসার সঙ্গে সেই প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার নির্মাণ না থাকলে লিখিত অক্ষর থেকে আলোক-বিচ্ছুরণ সম্ভবপর নয়। বিনয়ের জীবন ও কবিতা তারই প্রমাণ।

বি ন য় অ নু ভূ তি মা লা

কী এক ব্যথার ময়ূর বাজছে

ব্যক্তিগত বিনয় মজুমদার

প্রলয় মুখোপাধ্যায়

উজ্জ্বল আলোক পিণ্ডটির চারিদিকেই আমার পৃথিবী। পাই উত্তাপ। চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে খুঁজে পাই আমার অস্তিত্ব বোধ বেদনা খোঁজ ও বিনয়। বিনয় মজুমদার সূর্য। আমি অবস্থান। তাঁকে সবটুকু পাওয়া তো সম্ভব নয়। তবু সূর্যের আলো পৃথিবীর ওপর পড়ে। জন্ম নিতেই হয় ঘাস বায়ুমণ্ডল ঘাস।

.

তাঁর জন্মস্থানে কখনো যাইনি। দেখিনি চর্মচক্ষে। এমনকি স্পর্শ করলেও তো তাঁকে পেতাম না। তাঁর সকল প্রেম সকল বোধে যখন পৌঁছানোর চেষ্টা করছি লিখে ফেলেছেন--

''কবিতা বা গান...ভাবি, পাখিরা-কোকিল গান গায়
নিজের নিষ্কৃতি পেয়ে, পৃথিবীর কথা সে ভাবে না।''

আমার চেতনার জগতে অস্তিত্ব আর বোধের জগতে তিনি হানা দিচ্ছেন। তিনি আমার প্রেমের কবি। মহাশূন্য, অস্তিত্বহীনতার কবি। এখানেই চিরন্তন সংলাপ নাটুকে কাব্য-সর্বস্ব জগৎ থেকে মুক্তি দিচ্ছেন। মানুষ যে নিজেরই ধারণা আর মুগ্ধতার ট্রাপে পা দিয়ে চিরকাল রচনা মুখস্থ করেছে। পাখির সঙ্গমের বেদনা পাখির শূন্যতা দ্বারা তিনি মুক্তি ঘটিয়েছেন। তাদের গান কেবল মানুষের মুগ্ধতার জন্য নহে। কেবল বসন্ত কালের জন্য নহে। তাদের অন্য জগৎ অন্য পৃথিবী অন্য নিষ্ক্রমণ কিভাবে যেন বুঝেছেন। শুধু পাখি কি? শুধু কোকিল কি? ওই যে ট্রেনে বাসে লাল মাটির মানুষ হাতে একতারা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন? এ নিষ্কৃতি তাঁদের জন্যও। এ প্রেম কোনও বস্তু জীব জগত দ্বারা নিশ্চিত নয়। বরং অস্তিত্বের চেয়ে অস্তিত্বহীনতার স্বভাব তাঁর। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন তাঁর স্বভাবে কী এক ব্যথার ময়ূর বাজছে।

বিনয় মজুমদারের জীবনী দিয়ে কবিতার ব্যাখ্যা, কবিতায় পৌঁছতে চাওয়া বোকামি। তাঁকে ধরতে চাওয়া বোকামি। কাব্যগ্রন্থের ভার বহন করা সুইসাইড প্রবণতা। বরং অনুভব করা যাক। উপলব্ধি করা যাক।

''লতারা কি ভাবে বোঝে কাছে কোনও মহীরুহ আছে,
তার'পরে আরোহণ ক'রে তবে জীবনযাপন
করার সফল কীর্তি কি ভাবে যে করে, তা জানি না।
তবু বৃক্ষ সনাতন বৃক্ষই, লতাও শুধু লতা,
মৌমাছি ও কুসুমের অভীপ্সার রোমাঞ্চ জানে কি?''

এ মহাজগতের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যোগসূত্র তিনি ঘাঁটছেন। তিনি দর্শন করছেন তাঁর জীব আর জড়ের বৈশিষ্ট্যগুলি। একক মানুষ তাঁর হৃদয়ে নেই। একক প্রেম তাঁর খোঁজ নয়। সামগ্রিক যোগসূত্রগুলি থেকে সূত্র ধরে তিনি নির্বাচন করেছেন তাঁর অবস্থান। জড়বস্তু থেকে উদ্ভিদ থেকে ফুল থেকে মৌমাছি, তাঁর যাত্রায় অতিকায় ভূমি অতিকায় রথ। কিছুই স্পষ্ট নয়। কিছুই নির্ণয় নেই। এটা হলে ওটা হবে বলে দেওয়া নেই। কবিতা আর আত্ম-উপলব্ধির পথ অস্পষ্ট। মৌমাছি আর কুসুমের সম্পর্কের কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। ভাঙছেন না, খুলছেন না। এই সত্যের ভিতর পৌঁছেই কি তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন? মানুষকে আলাদাভাবে গুরুত্বহীন করে ফেললেন। নিজের সীমাবদ্ধতার কথা ভাবতে ভাবতে কি লিখছেন?

''সৃষ্টির মূল যে সূত্রগুলি তা জড়ের মধ্যে প্রকাশিত, উদ্ভিদের মধ্যে প্রকাশিত, মানুষের মধ্যে প্রকাশিত। এদের ভিতরের সূত্রগুলি পৃথক নয়, একই সূত্র তিনের ভিতরে বিদ্যমান''। ''এই ভার নেওয়া এই কবিতার বোধ বাংলা সাহিত্যের পক্ষে সম্ভব কি? বিনয় মজুমদারের পক্ষে সম্ভব ছিল? তিনি এই অস্থিরতা থেকেই কি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন? এ কি আত্মদর্শনের দংশন!

''সকল চিন্তাই তার একক একাধিপত্য অবাক করেছে
যে কোনও কাহিনী তাই শুধুমাত্র যৌনাঙ্গের আত্মকাহিনীই
যে কোনও চিন্তাই তাই এই চিন্তাকারীটির একক জীবনী
হয়ে যায়, হতে হয় তথাকথনের দোষে যাকে তুমি বলো
অবচেতনের রূপ; সব চুপ, চুপচাপ, ঘুমিয়ে পড়েছে
কেশর, পরাগ, ফুল, পাতা, জলপাই গাছ, জোছনা, ছায়া, সেতু।
জীবনে অত্যন্ত কম সহযোগিতাই এরা সকলে করেছে,

পরস্পর অতি অল্প সহযোগিতার এরা সুযোগ পেয়েছে,
তবু সহযোগিতা জীবনে কোথাও যদি নাও থাকে তবে
সকলের যার যার আপনার স্বার্থ আছে, স্বার্থরক্ষা আছে,
সহযোগিতার মতো অংশভাগী স্বার্থরক্ষা রয়েছে জীবনে।
যার যার আপনার স্বার্থরক্ষা পরস্পর ভাগাভাগি ক'রে
কি সুন্দর এ-নিসর্গ, মিলেমিশে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়েছে
কেশর, পরাগ, ফুল, পাতা, জলপাই গাছ, জোছনা, ছায়া, সেতু।''

চোদ্দো লাইন আমি লিখে এলাম। এখন আমার দরজা বন্ধ। এখন আমার মৃত পিতা। কী অসম্ভব বিনয় মজুমদার তাঁর লেখার মাধ্যমে আমার পিতাকে ব্যাখ্যা করেছে। যাকে আমি ব্যাখ্যা করি না। এখন ওই লাইনগুলি পড়ছি- -
''যার যার আপনার স্বার্থরক্ষা পরস্পর ভাগাভাগি ক'রে
কি সুন্দর এ-নিসর্গ, মিলে মিশে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়েছে
কেশর, পরাগ, ফুল, পাতা, জলপাই গাছ, জোছনা, ছায়া, সেতু।''

এই তিনটি লাইনে আমার আত্মজীবনী ব্যাখ্যা করেছেন। এ জগতের, জীবের শূন্যতার, সর্বনাশের এমন পারস্পরিক স্বার্থপরতাকে বলেছেন সহযোগিতা। জগতের যুদ্ধ, তোমার সর্বনাশ আমার সুইমিংপুল এসব স্বার্থপরতা আসলে সহযোগিতাই। গোটা শূন্যতা, গোটা গোটা ফোস্কা, তোমার অপরাধ আমার দেশপ্রেম আর বর্বর আসলে এ পৃথিবীর বুকে যা যা ঘটে, যা যা ঘটবে তা নূতন জন্মের নূতন ঘাসের তোমার আমার, মা সন্তানের, পিতা পুত্রের, ফায়ারিং স্কোয়াডে যা কিছু ঘটে চলেছে তা. নূতন পৃথিবীর। নূতন সম্পর্কের অথবা শূন্যতার জন্ম।

এ সত্য জেনে কার বন্দনা জাগে? কে বলে প্রেম আর খুন আলাদা? মহামারি আর ধানক্ষেত দুটিই সহযোগিতার ভিন্নদিক! বোধহয় অঘ্রাণের অনুভূতিমালা বিনয় মজুমদারের বিস্ফোরণ, সভ্যতার প্রতি, শৃঙ্খলের প্রতি। কবিতার দিকনির্দেশ, ভাষা, উপস্থাপনা বিভ্রান্ত করে। সুস্থ চেতনা, কাব্যময়তা, শান্তি, সুখ এই বোধগুলি বিদ্রূপ করে। কবি কি সত্যই মানসিক অসুস্থ ছিলেন! অসুস্থতার প্রতি তাঁর বিদ্রূপ, জগতের সংজ্ঞার প্রতি তাঁর করুণা করা উচিত। করেছেনও। তাঁর মানসিক জগৎ ধরার, ছোঁয়ার মেধা আমার কতটুকু! কীভাবে তিনি অন্ধকারকে বলেছেন মানসী! কেবলই বলেননি। জগতের সব বোধ, ঘটনা, অ্যাক্সিডেন্ট এ সবই কবিতা তাঁর কাছে। বোধহয় তাঁর দেহকে তিনি অনুপযুক্ত করেছেন তাঁকে ধারণের পাত্র হিসেবে ফুটো করেছেন।

''কখন আঁধার এসে এ-সকল এ'ক করে জড়িয়ে ধরেছে,
সব-কিছু একই ছিলো, না বলে ধরার পরে সকলে কি করে
একজন হতে পারে, আঁধার এবং আর-একজন হয়?
এখানে খেজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধা, কলসির মতো বড়ো হাঁড়ি।
গাছের মাথার শাদা, ঘিয়ের মতন রঙ মাথা থেকে চুয়ে
ফোঁটা ফোঁটা রস ঝরে, ফোঁটা ফোঁটা রস ঝরে, হাঁড়ির ভিতরে।
দুটি মান কচু পাতা কেঁপে ওঠে, দুলে যায় রাতের বাতাসে
রাতভর দুলে চুপিসারে যাবে ব'লে মনে হতে থাকে, চুপিসারে দুলে
সকালে শিশির ভিজে চুপিসারে থেমে যাবে, রাতের শিশির
কচুর পাতার গায়ে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে রবে, লেপটে যাবে না
এখন আঁধার এই সব কিছু এক ক'রে জড়িয়ে রয়েছে,
কেবল আঁধার জানে এক কাকে বলে বহু বলে কাকে।''

অন্ধকার যে শক্তি। অন্ধকার আমাদের দূরবর্তী স্থান। গভীর। পৌঁছানো বুদ্ধিগুলি প্রায় আলো হারিয়ে ফেলে। এই অন্ধকারের ভিতর জগতের . সকল স্পর্শ, সকল নিয়ম কি উপায়ে জাগতিক স্পর্শগুলি, অনিশ্চয়তাগুলি বেড়ে ওঠে। নানা রকম জন্মে কেউ খেজুর গাছ, কেউ মানকচু কেউ রস আর চেতনায় সম্পূর্ণ আলাদা। এসবই আমরা আলোয় আলাদা করি, আলোয় ভেদাভেদ করি। বিশ্লেষণ করি। এসব আলোর ফোকাসে। কিন্তু তার আড়ালে, অবগুণ্ঠনে ঘটে চলে জগতের যে মৃদু মৃদু দুর্যোগ। মৃদু ভেদাভেদ, দোষারোপ তো জন্মের পরই ঘটে। তার আগে তারও আগে অন্ধকার জন্মের প্রাক্কালে সবই তো এক অভিন্ন। এ শিশির, ফোঁটা ফোঁটা রসের প্রাক্কালে যে আঁধার সংগঠিত হয়, অর্থাৎ শূন্য পাত্রটিই অন্ধকার। সে একক। সে সামগ্রিক কোলাহল এক করে।

তাঁর, প্রকৃতির ছোটো ছোটো ক্রিয়া থেকে নেওয়া অনুরণন। খুনসুটি। দেখার ভঙ্গিমা। নিসর্গের যন্ত্রণা থেকে প্রাপ্ত আলোকরেখাটিই অঘ্রাণের অনুভূতিমালা। তিনি অনস্তিত্বের কবি। তিনি অঘ্রাণের কবি। তিনি জন্মহীন এক অবস্থার, আমার তোমার প্রেমের কবি। তাঁর প্রেম সামগ্রিক জগতের/ জগৎহীনতার বস্তুর/ শূন্যের, মানবিক/ পার্থিব, প্রেমের কবিতাই। ছোট্ট পিঁপড়ে মুখে খাদ্যের কণা নিয়ে কোথায় ছুটছে? তাঁর

অবস্থান হেতুই এ জগতের অঘ্রাণ। পারস্পরিক অবোধ, পারস্পরিক অসহযোগিতা যেন বোধেরই যেন ঘ্রাণের কবিতা। তিনি অতিচেতনার কবি। তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রেমের কবিতাই লিখেছেন। আমাদের গ্রহণ ক্ষমতা কম থাকার কারণেই তাঁর প্রেম অন্যরকম হওয়ার কারণেই গ্রহণ করতে অক্ষম। তিনি ভালবাসা দিয়েছেন আমরা গ্রহণে অক্ষম। ফলে ভার বইতে না পেরে বাংলা কবিতা বিনয় মজুমদারকে আংশিক, অস্পষ্ট গ্রহণ করেছে। এই শক্তি এই সামর্থ্য তাঁকে একঘরে রেখেছে আজও। কয়েকটা পুরস্কার কয়েকটা আলোচনা তাঁর ভারবহনে অক্ষম হেতু আমাদের করুণা করেছেন। অঘ্রাণের অনুভূতিমালাই তাঁর এ গোটা উপমহাদেশের এক বিস্ময়। যাকে ব্যাখ্যা করার ভার গ্রহণ আর আত্মহত্যা এক ব্যপার। তিনি মানুষের অবস্থান, উৎস ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা নিয়েই লিখেছেন আমার আত্মজীবনী। আমার বাবার আত্মজীবনী। আসলে একটাই কবিতাই একটাই কাব্যগ্রন্থ কীট পতঙ্গ অণু পরমাণু যৌনতা সঙ্গমের সাথে মানুষের আলাদা করে পরিচয় নয়। বরং একটাই ছন্দ অথবা ছন্দহীনতা গতি অথবা স্থিতির সুতোটিকে টেনে টেনে দেখেছেন শুনেছেন আর্তনাদ। অঘ্রাণের অনুভূতি কেবল কবিতাই। প্রেমের কবিতা। ধ্যানমগ্ন এক সাধক। তুলোর খোসার মতো,তুলোর সুতোগুলি টেনে টেনে দেখেছেন আলাদা কিছুই নয়। একেটাই তুলোর দলা, আঁশের সুতো দ্বারা এক অপরের সাথে যুক্ত। সমগ্র জগতের একক ধারণাই ভুল। আমিই ভুল। জন্মের ধারণাও ভুল। মৃত্যুর ধারণাও ভুল। তাই ঘ্রাণ যে কেবল বস্তুকে মাটিকে ফুলকে নারীকে আলাদা করে তাই নয়। বরং মানুষের ঘ্রাণের বাইরে যে বিশাল অস্তিত্ব তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঘ্রাণ যে কেবল বস্তুর অস্তিত্বকে নির্দিষ্ট করে। করে না? মাছের ঘ্রাণ কেবল কেবল মাছই নির্দিষ্ট করে। মাছের সাথে এই যে নদী, নদীর তলদেশ আহা অসীম ডালিম। ডালিম ফলের ভেতরে ঘটে যাওয়া রস, তার প্রজনন তার চরিত্র কিছুই তো জানা যায় না। কেবল মাছের ঘ্রাণ নয় তিনি অঘ্রাণ নিতে পেরেছেন। কারণ ওই গন্ধের সাথে জড়িত ঘ্রাণের মুগ্ধতা ত্যাগ করেছেন। জুঁই ফুলের মুগ্ধতা হেতু যে সীমা যে গণ্ডিতে জড়িয়ে যায় মানব সত্ত্বা, কেবল জুঁহি জুঁহি করে, তিনি তাকেই ত্যাগ করছেন। ফলে অঘ্রাণের যে বিশাল জগৎ অসীম ঘ্রাণের তারকা তিনি পেয়েছেন তার স্পর্শ। এই বোধ কবিতা দর্শনের বিজ্ঞানের গণ্ডী ছাড়িয়ে তাঁকে দাঁড় করিয়েছে আপাত সাধারণ আপাত ক্ষুদ্র সরল জগতের ভেতর তোমায়।

তিনি প্রকৃতিতে কেবল মুগ্ধ নন। আছন্ন বরং সতর্ক। মানুষের স্পর্শের ঘ্রাণের, স্বাদের, বর্ণের, বোধের সীমাটি তিনি ছুঁয়েছেন কিন্তু ভাঙেননি। তিনি টিপে টিপে দেখছেন এ তবে স্পর্শ, ওই কাঁচাটি ঘ্রাণ! এই খাঁচা তবে বর্ণ! এ সব খাঁচার ভেতর মানুষের পাখিগুলি বন্দী। এসো অঘ্রাণে ওড়াই স্পর্শ, দেখো অঘ্রাণেই ওড়ে ঘ্রাণ। ঘ্রাণ কেবল মধুর সুঘ্রাণ ভারী করে। সংকীর্ণ করে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করে। যে দেশে যত ঘ্রাণের সঞ্চয়। যত উজ্জ্বল যত ডালিমের সঞ্চয়। তারা কোথাও আলাদা। ধনী। মর্যাদায় টং। তাই তুমি আমার তুমি অঘ্রাণে নামো। যে ফুলের গন্ধ কম তার যাতায়াতে নামো। ঘ্রাণ তো কেবল সীমা। শরীরের মোড়ক। চেতনার কুয়ো।

''ভাবি মনে-মনে ভাবি, ক্রিসেনথেমাম ফুলে ঘ্রাণ প্রায় নেই;
নেই ব'লে সুবাতাস সহজেই কেয়ারির মাঝে ঢুকে পড়ে,
ভিতরেই ঢুকে পড়ে, মাঝ দিয়ে অনায়াসে চলাচল করে।
খুব বেশি ঘ্রাণ হলে--গাঢ় ঘ্রাণময় হলে বাতাস সহজে
কেয়ারিতে ঢুকে যেতে কখনো পারে না, ঘ্রাণই বাধা দিতে থাকে,
কোনোমতে জোর ক'রে দায়সারা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না,
আমাদের বাতাসের উপায় থাকে না, তাই বাতাসের মতে,
খুব কম ঘ্রাণময় ফুলের কেয়ারিগুলি সবচেয়ে ভালো,''

প্রকৃতির সাথে তাঁর বোঝাপড়া কত নিখিল। মোরগের মতো খুঁটে খুঁটে উপাদানগুলি সঞ্চয় করেছেন। তাঁর প্রবল কবিতার জলোচ্ছ্বাস, প্লাবিত করে দেয় প্রচলিত ঘ্রাণ।

''এখন এখানে ব'সে কেয়ারির পাশে ব'সে উঁকি মেরে দেখি
স্থান-কাল অনুসারে, যেন শব্দ নিয়ে এসে সাজানো হয়েছে
যার-যার জায়গায় ব'সে গেছে সুনিয়মে পঙক্তিতে-পঙক্তিতে
নিখুঁত জ্যামিতি থেকে উঠে এসে অবশেষে ফুল ফুটে গেছে,
পায়ের নিচের জমি থেকে উঠে এসে চোখের নিকটে,
দাঁড়ালেই দেখা যায়, ফুলগুলি ফুটে আছে মুখের নিকটে,
জমি থেকে উঠে এসে ফুলগুলি ফোটে শুধু ঠোঁটের নিকটে।
ফুলের ভিতরে কোনো জ্যামিতি বা জ্যামিতির ইশারাও নেই;
সব ফুল মিলে মিশে একাকার, এলোমেলো হয়ে প'ড়ে আছে।''
জ্যামিতি জমিতে ছিল, পঙ্‌ক্তিতে-পঙ্‌ক্তিতে শুধু জ্যামিতিই ছিলো।
ফুলের ভিতরে ওই জ্যামিতি বা জ্যামিতির ইশারাও নেই;
সব ফুল মিলে মিশে একাকার, এলোমেলো হয়ে প'ড়ে আছেন''

তাঁর মানস নেত্র। তাঁর লুব্ধকের আলো। যাত্রাটি দেখো। ফুলের ভিতর মুগ্ধ করার যে প্রবৃত্তি আছে, আকার, উষ্ণতা, তৃপ্তি আছে কিন্তু ফুলের মধ্যে নেই। আছে মাটিতে। একই মাটির রস সঞ্চয়ে কেউ কেয়ারি কেউ গাঁদার কেউ তো জবার। অর্থাৎ আলাদা করে কেউ এক নয়। ঐ মাটির মধ্যেই তাদের সব জ্যামিতি। তিনি ফুলে মুগ্ধ নন। ফুলের রঙে আকৃষ্ট নন বরং প্রকৃতির রূপ তাঁকে আছন্ন নয় তিনি তার অংশে হিসেবেই অঘ্রাণে সাদায় কালোয় নিরাকারের প্রেমে পড়েছিলেন। ব্যাপ্তি তাই বিশাল। বোধ তাই সাগর। কোথাও তার থামাটি নেই। এক বোধ থেকে অন্যবোধে এক রূপ থেকে ভিন্ন রূপে যাত্রাটি লেগে আছে। তাই তিনি প্রকৃতির, নিসর্গের রূপসী বাংলার কবি নন। তিনি অসীমের কবি। অতিপ্রাকৃত কবি। জীবন আর মৃত্যুর মুল সুরগুলি সাজিয়ে তার গমক। যেন প্রকৃতির ভিতরে প্রকৃতিকে ছুঁয়ে এলেন এইমাত্র। সাদা চোখে ব্যাখ্যা নেই। মিলেমিশে সব একাকার। এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। সামগ্রিকতার ভেতর একক। এককের ভেতর সামগ্রিক জগত আর যন্ত্রণার মাইলস্টোন অঘ্রাণের অনুভূতিমালা, নিজেকে সমর্পণ করেছেন এই অন্তর প্রকৃতির কাছে যেখানে প্রকৃত বিরুদ্ধ যা সবকিছুই সিদ্ধ। বোধহয় তিনি কোথাও নিজেকে বেঁধে ফেলেননি। চলেছেন কেবল চলেছেন বিশ্ব জগতের মূল অঘ্রাণে পাড়ি দিতে দিতে চলেছেন অসীমে।

বি ন য় অ নু ভূ তি মা লা

এসো হে নদী এসো অসীম

মণিশঙ্কর

এক জীবনই যথেষ্ট নদীটির কাছে। এই ভাবনায় বয়ে চলা পথ কুয়াশায় ঢেকে গেলে খুদগন্ধ জাগে আগুনের নাকে। দেহের পরতে সাজে ফাগুন, নদীটি ভারী আপনতর হয়। নীলজলের ইশারায় বাড়ে নিবিড়তা। ঘনীভূত হয় আকাঙ্ক্ষিত প্রেমের আলেখ্য। 'হে আলেখ্য অপচয় চিরকাল পৃথিবীতে আছে। এই যে অমেয় জল, মেঘে মেঘে তনুভূত জল; এর কতটুকু আর ফসলের দেহে আসে বলো? ফসলের ঋতুতেও অধিকাংশ শুষে নেয় মাটি।'

তবু ভরা আলেখ্য বীজবতী হয়; স্বপ্নে। জলবতী হয় গাভিন নদীটি; আশায়। আঁজলাভরা জল--শুধু জ্বালা জুড়ানোর আশায় বিনয়ী হই। দেখি বিষণ্ণতা বিছিয়ে আছে যৌবনবতী অনূঢ়া নদীটির তনুতটে। তবু বয়। বয়ে চলে বসন্ত-বিষাদ। তারই শনশনে শুনি, 'অপূর্ণের ক্লেশ এই, যে শাখাগ্রে ফাল্গুনে আমের বোল মুকুলিত হয়, সে শাখায় নতুন পাতার উদ্‌গমের পথ নেই। কোথায় মুকুলিত প্রেম'?

তবে! একি শুধুই ভাবালুতাসর্বস্ব কথামালা! নৃ-ঐতিহ্যে ব্যাপ্ত হৃদয়ের প্রেম অভিজ্ঞান নয়! নয় আলোকপর্বমুখী বোধ!

তবে কেন দাউ-দাউ গায় মন? কেন শুনি সাবধানবার্তা-- 'সন্তপ্ত কুসুম ফুটে পুনরায় ক্ষোভে ঝরে যায়। দেখে কবিকুল এত ক্লেশ পায়, অথচ হে তরু, তুমি নিজে নির্বিকার, এই প্রিয় বেদনা বোঝো না। কে কোথায় নিভে গেছে তার গুপ্ত কাহিনী জানি। নিজের অন্তরে দেখি, কবিতার কোনও পঙ্‌ক্তি আর মনে নেই গোধূলিতে; ভালোবাসা অবশিষ্ট নেই। অথবা গৃহের থেকে ভুল বহির্গত কোনও শিশু হারিয়ে গেছে পথে, জানে না সে নিজের ঠিকানা।'

ঠিকানাহীন হয়েই তো আশৈশব পরিক্রমা পৃথিবীর পথে। মাঝিহীন নৌকার মতো মাঝে মাঝে ঘাটে ঘাটে ঠেকি। ঠেকেছি আপাত-ঠিকানায়। জেনেছি, 'গাছ দেখে বোঝা যায় কোন জায়গা ভালো।' বেঁধেছি ঘর। বুঝেছি, 'সবচেয়ে ভালো সুনিদ্রা দেয় পাখি'। এমনকি 'দোয়েলের শিস শোনা ভাগ্যের ব্যাপার।'

সেই ভাগ্যের ব্যাপারটিই কি ঘটেছে কখনও! যে অনন্তের ক্ষুধা

অসীম গহ্বরে লীন হয় তার স্বাদটুকু নিয়ে, 'কী উৎফুল্ল আশা নিয়ে সকালে জেগেছি সবিনয়ে'। দাঁড়িয়েছি তরুতলে। দেখেছি, কত অজস্র ফুলের চুমা ডালে ডালে মুকুলিত। তবু হু-হু মনপুড়ান থামেনি তো। হাহাকার-দহন-দাহ ঘনিয়ে বসেছে গাঢ়তর অভিমানে। অবাধ্যতাকে বোঝাতে চেয়ে বলেছি, ' আর যদি নাই আসো, ফুটন্ত জলের নভোচারী বাষ্পের সহিত যদি বাতাসের মতো নাই মেশো, সেও এক অভিজ্ঞতা; অগণন কুসুমের দেশে নীল বা নীলাভবর্ণ গোলাপের অভাবের মতো তোমার অভাব বুঝি; কে জানে হয়তো অবশেষে বিগলিত হতে পারো; আশ্চর্য দর্শন বহু আছে-- নিজের চুলের মৃদু ঘ্রাণের মতন তোমাকেও হয়তো পাই না আমি, পূর্ণিমার তিথিতেও দেখি অস্ফুট লজ্জায় ক্ষীণ চন্দ্রকলা উঠে থাকে, গ্রহণ হবার ফলে, এরূপ দর্শন বহু আছে।' আছে বলেই তো গাছ আজও গাছ। আছে বলেই তো পাতায় পাতায় মৃদু ঘ্রাণ ছড়িয়ে রাখে প্রেম। মাটিমুখে চেয়ে থাকে তাদের পরিপাটি সোহাগ। বৃন্তে বৃন্তে ফুল আগমনী গায় ভবিষ্যের। তবু 'মাটি থেকে ফল এইটুকু তো দূরত্ব, কিন্তু কত তফাৎ!'

কোনোভাবেই কি সে তফাৎ মুছবে না আমার চেতনার নিসর্গ থেকে! কখনও কি পাখিমন আকাশ পাবে না। নীলের হৃদয়--সে তো হাতছানির টান। তাতো 'শরীরের তুলনায় প্রজাপতির পাখনা কত বড়ো!' কত বড়ো তার পরাগ-প্রেম। তবু 'অত্যন্ত নিপূণভাবে আমাকে আহত রেখে একটি মোটরকার পরিছন্নভাবে চ'লে গেলা। থেমে ফিরে তাকালেই দেখে যেতো, অবাক আঘাতে কী আশ্চর্য সূর্যোদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে কুয়াশা, কী বিস্মিত বেদনায় একা-একা কেঁদে ফেরে শিশু।'

তবে কি এ আমারই মনের রোগ! অনন্তেলীন-খুদা আসলে এক মায়াজাল! মোহ-ঘোরের নামে নারী-প্রেম! তবে কি মানবজীবন ঘনিষ্ঠ হতাশা, বিষণ্ণতা, প্রত্যাখ্যান, বিরহ-দাহ এক ধরনের মনোবিকার! শুধুই জৈবিক মিথুন-সত্তায় আক্রান্ত! তবে যে বারেবারে বলি, 'কবিতা সমাপ্ত হতে দাও, নারী, ক্রমে-ক্রমাগত ছন্দিত, ঘর্ষণে, দ্যাখো, উত্তেজনা শীর্ষলাভ করে। আমাদের চিন্তাপাত, রসপাত ঘটে, শান্তি নামে। আড়ালে যেও না যেন ঘুম পাড়াবার সাধ করে।' জানি, 'রক্তের ভিতর জ্যোৎস্না; তবু বুঝি, আজ পরিশেষে মাংসভোজনের উষ্ণ প্রয়োজন; তা না-হলে নেই মদিরার পূর্ণ তৃপ্তি; তোমার দেহের কথা ভাবি-- নির্বিকার কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে অন্ধকার, সুখ এমন আশ্চর্যভাবে মিশে আছে;'

তবু কেন 'বেদনার গাঢ় রসে আপক্ক রক্তিম হলো ফল'? কেন আমারই লাশের পুঁতিগন্ধ থেকে 'ঝরে পুঁজ, ঝরে স্মৃতি, রহস্যনিলীনা অপসৃতা কুমারীত্ব থেকে দূরে, আরো দূরে, অবরুদ্ধ নীড়ে। আর আমি অর্ধমৃত; বৃক্ষদের ব্যাপক অসুখে শুশ্রূষা করার মতো অনাবিল প্রিয়জনও নেই।'

তাতো 'আমর সৃষ্টিরা আজ কাগজের ভগ্নাংশে নিহিত কিছু ছন্দে, ভীরু মিলে আলোড়িত কাব্যের কণিকা এখন বিক্ষিপ্ত নানা বায়ুপথে, ঝড়ের সম্মুখে। আমাকে ডাকে না কেউ নিরলস প্রেমের বিস্তারে'। না ডাকুক। নাইবা খেয়া পাক চিরন্তন ঘাট, ভেসে বেড়ানো-- সেও এক বিরল অভিজ্ঞতা। এসো হে নদী--এসো অসীম--এসো প্রেম দেবো আরও আরও। নিতে নাইবা সক্ষম হলে। তবু আমার দান আমারই আত্মনিবেদন। 'হৃদয় নিঃশব্দে বাজো; তারকা, কুসুম, অঙ্গুরীয়,-এদের কখনো আরো সরব সংগীত শোনাব না। বধির স্বস্থানে আছে; অথবা নিজের ভুলে পৃথিবী তৃষ্ণা দ্যাখে, পৃথিবীর বিপণিতে থেকে। কবিতা লিখেছি কবে, দু-জনে চকিত চেতনায়। অবশেষে ফুল ঝ'রে আছে শুধু সুর। কবিতা বা গান ভাবি, পাখিরা-কোকিল গান ঝরে অশ্রু গায় নিজের নিষ্কৃতি পেয়ে, পৃথিবীর কথা সে ভাবে না।'

আমিও গান হবো। ফুল হবো। জল হবো। গভীর হবো অতল দিঘিতে। 'আমার আশ্চর্য ফুল, যেন চকোলেট, নিমেষেই গলাঃধকরণ তাকে না ক'রে ক্রমশ রস নিয়ে তৃপ্ত হই। দীর্ঘ তৃষ্ণা ভুলে থাকি আবিস্কারে প্রেমে। অনেক ভেবেছি আমি, অনেক ছোবল নিয়ে প্রাণে জেনেছি বিদীর্ণ হওয়া কাকে বলে নীল-- আকাশের হৃদয়ের; কাকে বলে নির্বিকার পাখি। অথবা ফড়িং তার স্বচ্ছ ডানা মেলে উড়ে যায়। উড়ে যায় শ্বাস ফেলে যুবকের প্রাণের উপরে। আমি রোগে মুগ্ধ হয়ে দৃশ্য দেখি, দেখি জানালায় আকাশের লালা ঝরে বাতাসের আশ্রয়ে আশ্রয়ে।

আমি মুগ্ধ; উড়ে গেছ; ফিরে এসো চাকা, রথ হয়ে, জয় হয়ে, চিরন্তন কাব্য হয়ে এসো। আমরা বিশুদ্ধ দেশে গান হবো, প্রেম হবো, অবয়বহীন...

এক দৈবী হওয়া

পার্থসারথি দে

তাহলে 'বিদীর্ণ হওয়া কাকে বলে' এর উত্তর খুঁজে পাওয়াই কি সব রহস্যের উত্তর। কোন রহস্য? যা জগৎ ও জীবন ব্যাপিত ও উদ্যত হয়ে আছে। হয়ে আছে কবিতার ভেতর। মানুষের প্রাণের ভিতর। তাই কি কবি বিনয় বলে ওঠেন--

''অনেক ভেবেছি আমি, অনেক ছোবল নিয়ে প্রাণে
জেনেছি বিদীর্ণ হওয়া কাকে বলে, কাকে বলে নীল--
আকাশের, হৃদয়ের; কাকে বলে নির্বিকার পাখি।''

কবি বিনয় জানাচ্ছেন বিদীর্ণ হওয়ার উত্তর তিনি খুঁজে পেয়েছেন। অর্থাৎ রহস্যের আবরণ তিনি উন্মোচন করেছেন। তাহলে কি তিনি সেই দিব্যত্ব লাভ করলেন যা তাঁকে দিয়ে অমৃতময় পঙ্‌ক্তিমালা লিখিয়ে নিয়েছে। নাহলে কেন তিনি 'ফিরে এসো চাকা'র ঠিক পরেই বলেছেন, আকাশের-নীলের সংজ্ঞাত তিনি জানেন। এইজন্যই কি তিনি আপাত দৃষ্টিতে ধূসর, অগোছালো, অবিনীত, এবং কিছুটা উন্মাদ দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন? কথিত আছে যাঁরা ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ করেছেন, যেমন রামকৃষ্ণদেব কিংবা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলেই বাহ্যিক আচরণে অনেকটাই অন্যরকম ছিলেন। বিনয় মজুমদার এঁদের মতোন কোনও 'অবতার' ছিলেন না কিন্তু একজন প্রকৃত কবি স্রষ্টা তো ঈশ্বরেরই সমানধর্মী। যিনি এরকম হয়ে উঠতে পারেন, তিনিই বোধহয় বিনয়ের মতো হয়ে যান।

আশ্চর্যের কথা, আকাশ-নীল-হৃদয়ের সংজ্ঞা জানার পর এই কবি 'নির্বিকার পাখি'র উল্লেখ করেন। পাখি কেমন? নির্বিকার। অর্থাৎ নির্লিপ্ত। কোনও বিষয়ে আসক্তি নেই যার। সে উড়ে চলে যায়। শ্বাস ফেলে কোথায়? যুবকের প্রাণের উপরে। স্বচ্ছ ডানা ভেদ করে যায় আলোকরেখা। তা প্রবেশ করে শ্বাসের প্রতীকে মানুষের হৃদয় গভীরে। ফড়িং আর নির্লিপ্ত পাখির মাধ্যমে এক অলৌকিক স্বর, এক দৈবী হাওয়া মানুষের নগ্নচৈতন্যে প্রবেশ করে। আর তখনই হাত-পাওয়ালা মানুষও অলৌকিক কণ্ঠস্বরের অধিকারী হয়ে ওঠে। তখনই বোধ হয় মাথার ভেতরে অদৃশ্য কোনও বোধ কাজ করে মাথাও একটু আলুলায়িত করে দেয়। বিনয় মজুমদারের মতন কারও কারও হাত দিয়ে তখন বেরিয়ে আসে--

''...মুগ্ধ হয়ে দৃশ্য দেখি, দেখি জানালায়
আকাশের লালা ঝরে বাতাসের আশ্রয়ে আশ্রয়ে।''

যদি কোনও একজনও এই নির্বিকার পাখি অথবা স্বচ্ছ ডানার ফড়িং অথবা আকাশের লালা ঝরা অনুভব করতে পারেন, তবেই তিনি লিখতে পারেন--

''উড়ে গেছো; ফিরে এসো, ফিরে এসো, চাকা,
রথ হয়ে, জয় হয়ে, চিরন্তন কাব্য হয়ে এসো।

ফিরে এসো। কি? আসলে ওই পাখি, ফড়িং আকাশের নীল ঝরে পড়ার ঘূর্ণন আর তার অনুভব চক্রাকারে চলুক। ফিরে ফিরে আসুক বিশুদ্ধ প্রেমের অনুভব। তাহলেই কবি এবং তার দৃশ্যমান সমস্ত কিছু এক আকাশে নয় সব আকাশেই সুর ছড়াতে পারে। ---

''আমরা বিশুদ্ধ দেশে গান হবো, প্রেম হবো, অবয়বহীন
সুর হয়ে লিপ্ত হবো পৃথিবীর সকল আকাশে।''

আহা! এই রামধনু আকাশে কোথায় গায়ত্রী? 'চাকা' শব্দটির সঙ্গে বিনয়ের (অ) তৃপ্ত প্রেমসত্তার মূর্তিমতী গায়ত্রীকে জুড়ে দিয়ে মিথ তৈরি হয়েছে। কিন্তু বিনয় মজুমদারের সর্বাধিক প্রচারিত ' ফিরে এসো চাকা' ব্যক্তিগত প্রেমিকার উদ্ভাস কোথায়? আসলে 'ফিরে এসো চাকা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণের নাম ছিল'গায়ত্রীকে'। সেখান থেকেই মিথের শুরু। যা নিয়ে কবির নানাকথনও সাহায্যকারীর ভূমিকা নিয়েছে।

দুই

'কী রহস্য যেন সর্বদা আমাকে ঘিরে রাখে।' আজও সেই রহস্য কবিকে ঘিরে বেড়েছে বই কমেনি। কবি বিনয় মজুমদারের যাপিত জীবন, তাঁর কাব্য কৌশল, প্রেম আকা া তাঁর গাণিতিক বোধ, ছন্দচেতনা, জীবনানন্দ, সমাজভাবনা, মানসিক হাস্কপাতাল, বাবা-মা-বুচি, কফি হাউস, কৃত্তিবাস সব যেন একসূত্রে বাঁধা। একাকার--

...আলাদা আলাদা সব সমীকরণের
আলাদা সকল চিত্র একীভূত সমীকরণের
জ্যামিতিক রূপায়ন পাওয়া যায়, তার মানে অনেক সূত্রকে
একীভূত তো বোঝা যায় কেবল একটিমাত্র ক'রে ফেলা যায়।
তাতে আমাদের কিছু লাভ হয় এখানে আমার বৌ রাধা
এই লিখে রাখা ভালো সবার অবগতির জন্যই নিশ্চয়।

একীভূত তো বোঝা যায়। কিন্তু রাধা? কোন ভেদ ও অভেদের যাতায়াতের রাধা প্রবেশ করে একত্রিত হয়ে যায় তা রহস্যাবৃত।

'ফিরে এসো চাকা' বা 'গায়ত্রীকে' বা 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী' নয় বিনয় মজুমদারের শ্রেষ্ঠ সম্ভার 'অঘ্রাণের অনুভূতিমালা'-য়
'সেতু চুপে শুয়ে আছে তার ছায়ার উপরে
ছায়া কেঁপে কেঁপে ওঠে থেকে থেকে জয়ী-হওয়া সেতুর বাতাসে।'

চুপচাপ শুয়ে থাকা সেতু ভাবনার জগতে এক অদৃশ্য প্লাবন। কেননা এর পরেই কবি লিখেছেন আসলে সেতু নয় শুয়ে আছে তার ছায়া। ঘুমিয়ে আছে। ঠিক যেমন এক দৃশ্যমান মানুষের অন্তরালে ঘুমিয়ে থাকে অন্য আর এক মানুষ। বাইরের দারুণ অভিঘাত তার ঘুম কখনো কখনো ভাঙিয়ে দেয়-- ছায়া কেঁপে কেঁপে ওঠে।

রবীন্দ্র-জীবনানন্দ উত্তরকালে বিনয় মজুমদার এক স্বতন্ত্র ঘরানা। তিনি শুধু তাঁর বাহ্যিক জীবনযাপনেই এড়িয়ে চলতেন অ-প্রকৃত মানুষকে। মানুষের মিথ্যাচার হিংসা তাঁকে ব্যথিত করত বলেই এই নিঃসঙ্গ মানুষটি নিজেকেই নিজের সঙ্গী করে তুলেছিলেন। কখনো গাছের পাতা ঝরার শব্দের মধ্যে কবিতাকে খুঁজেছেন। কখনো বা রেলগাড়ি চলে যাওয়ার অনুরণনের মধ্যে। ---
বিশাল দুপুরবেলা চারিদিকে ফুটে আছে, ফুটে আছে আকাশে
আকাশে
সব কিছু -- এ পাহাড়, গাছপালা আলোছায়া, পত্রিকায় প্রকাশে
এসেছে এই অতিদীর্ঘ ২৬ যাত্রার দীর্ঘ বিনাস্যের মধ্যেই তিনি প্রলম্বিত শ্বাস ফেলেছিলেন। বলেছিলেন একান্ত ভালবাসার কথা। যেখানে ভালবাসার মধ্যে গণিত মিশে আছে। আসলে অঙ্ক ছিল তাঁর কাছে এক অপরিমেয় দর্শন কিন্তু জীবনের অঙ্ক,তাঁর সুদ-আসল এই হিসেব তাণর করা হয়ে ওঠেনি কখনো। প্রথম থেকেই জীবনের সুখ-সুবিধের দিক থেকে তিনি মুখ ঘুরিয়ে রেখেছিলেন। জীবন ছাপিয়ে এক অন্যতর বোধে, অন্যতর দর্শনে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন বরাবর। ভীড় পছন্দ করতে পারতেন না তিনি। তার মাথা যে ছিল গণিতের সমীকরণে ঠাসা। তাই অন্য চাপ নিতে চাননি। ---

'যদি কাছাকাছি থাকি তবে আর উদয়ের ভাবনায় কখনো পড়ি না।
মানুষের দেহে ধৃত অনুভূতি চলে আসা, গণিতের মাঝে ধৃত দর্শন
এসেছে

আসে ধৃত অনুভূতি-অনুভূতি, এগুলিকে যথাক্রমে যন্ত্রবৃত ভাব
শরীরে ভাব আর গণিতের ভাব আর কবিতার ভাব বলা সংগত
সহজ।'
এইভাবেই বিনয় মজুমদারের কবিতার সাথে গণিত এবং গণিতের সাথে কবিতা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এক অদ্ভুত এবং আশ্চর্য অনুবদ্ধ(Co-relation) তৈরি হয় স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের মধ্যে। জড়পৃথিবী ও মনোপৃথিবীর মধ্যে। কাব্যে সমস্ত পর্যায় শেষে কবিতাগুলি উন্নীত হয় এক বিশ্বজনীন দার্শনিক স্তরে--'একদিন, স্বর সুর তেমনই এক হয়ে স্বরলিপি আসে।'

তিন

যদি বিনয় মজুমদারের সবকটি কাব্যগ্রন্থ পাশাপাশি রাখা যায়, তবে দেখব 'অঘ্রাণের অণুভূতিমালা' পর্যন্ত যে ঘোরের কবিতা, 'বাল্মীকির কবিতা' সে ঘোরের নয়। এক ক্রমাগত বির্বতন বিষয়বস্তু বা রচনাশৈলীতে লক্ষ করা গেলেও বাল্মীকির কবিতা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এখানে যৌনতার বিশদ আভাস স্পষ্টতই নজর এড়ায় না।

-- ফুল তুমি শাড়ি খোলো নানা অর্থে ভেবে দ্যাখো রাত দুপুরের থেকে আমাদের দিন শুরু হয়
(কবিতার খসড়া /১০)
অথবা
আরো বেশি ঘনঘন বসবার ইচ্ছা হয়; . . .
(আরো বেশি ঘন)

সবথেকে বড়ো কথা এই পর্যায়ের কবিতাগুলি অর্থাৎ অঘ্রাণের অনুভূতি মালা পর্যন্ত যে প্রথম বা অলৌকিক পর্যায় তার পরবর্তী স্তরের কবিতাগুলি কথোপকথন ধর্মী। কবি নিজেই নিজের সঙ্গে কথা বলেছেন। কতিাগুলি যেন কবির নিজের সাথে নিজের বোঝাপড়া। আসলে কবি তাঁর নিজস্ব পৃথিবীর কোন্ অমৃতলোকে বাস করেন তারই প্রতিফলন ঘটে সত্যিকারের কবিতায়। কবি বিনয়মজুমদারও ব্যতিক্রমী।

কবির প্রতিটা কবিতা আলাদাভাবে কাটাছেঁড়া করলে ছন্দ, অলংকার ইত্যাদি অনেক কবিতাকেন্দ্রিক বাহ্যিক ও আত্মিক দিক বেরিয়ে আসবে। খুঁজে পাওয়া যাবে সনেটের আশ্চর্য, পরমাশ্চর্য উদাহরণ। মাত্রার অপরূপ রকমফের। পয়ার, মহাপয়ার, অমিল-সমিল গদ্যের নিরন্তর নিরীক্ষণ। ছন্দ বা প্রকরণে গণিতের এই আশ্চর্য ব্যবহারের মধ্যেই লুকিয়ে আছেন কবি নন গাণিতিক বিনয়।

রহস্যাবৃত তার থেকে ঢের ঢের রহস্য লুকিয়ে আছে জীবনানন্দ উত্তরকালের বা কৃত্তিবাস যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বিনয় মজুমদারের কবিতায়।

শাশ্বত রহস্যের অনুধ্যান

অমিত সাহা

''সত্যের যথার্থ উপলব্ধিমাত্রই আনন্দ, তাহাই চরম সৌন্দর্য'' (সৌন্দর্যবোধ:রবীন্দ্রনাথ)-- সত্যসন্ধ বিনয় মজুমদারের এই উপলব্ধি যে হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও জায়গা নেই। তিনি স্বকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন, 'যে কথা শুনে মনে আনন্দ হয়, তাই-ই সত্য। বিচ্ছেদ বিরহ যন্ত্রণার মধ্যেও খুঁজে পেয়েছেন অনন্ত আনন্দ-অসীম সৌন্দর্য । তাঁর কাব্যসাহিত্যে রহস্য উদ্‌ঘাটনে পাঠকের প্রচেষ্টাই প্রমাণ করে বিনয়ভাষার ঋদ্ধতা। তিনি সাধক কবি...ঋষি...দার্শনিক। আজীবন কবিতারই সাধনা করে গেলেন। পাঠকের চেতনায় আঘাত দিতে পারেন যে কবি, তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা আসন দিতেই হয়। প্রসঙ্গত মনে পড়ে নন্দলাল বসুর উক্তি, তিনি 'শিল্পসৃষ্টির মূলসূত্রে' বলেছেন-- শিল্প ''সৃষ্টি হয় অনুরাগের পথে, তার সাধনা অনুরাগকেই আশ্রয় করে। অনুরাগ আগে বিচার বিশ্লেষণ পরে''। কাব্যশিল্পের প্রতি বিনয়ের একনিষ্ঠ অনুরাগেই দর্শন চিন্তার স্ফুরণ ঘটে। অথচ শাস্ত্রগত দিক থেকে দর্শন হল শৃঙ্খলাবদ্ধ ও যুক্তিনিষ্ঠ, আর কাব্য সমুদ্রের মতো উচ্ছল, বেগবান, প্রশান্তময় তার ব্যাপ্তি। তবু মুখ্য উপাদান সেই জীবন। চিরন্তন জীবনসত্যের কথা, প্রকৃতির কথা, অধ্যাত্মচেতনার বিকাশ--এসবই মূর্ত হয়ে ওঠে শব্দ ও অর্থের গভীর অন্বয়ে

"The real emotions, the positive needs of life, have always in them some element of disquiet'' (Aristotle's Theory of Poetry and Fine Arts: S.H. Butcher)--- কবি বিনয় মজুমদারও বিশ্বাস করেন, জীবনে আসল ভাবগুলোর বাস্তব প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে সবসময় এক অশান্ত উপমান বিদ্যমান। তাঁর মতে 'মানসনেত্রের এক বিশ্ব আছে, মানসের বিশ্বও বাস্তব'। তাই তিনি লিখতে পারেন, 'বিদেশি ভাষার মতো সাবধানে/ তোমার প্রসঙ্গে আসি'। অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি-- এ দুটোই মানুষের জীবনে সবচেয়ে সূক্ষ্মতম নরম বোধ যা আলোর স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ। এগুলো চেতনার প্রতিটি স্তরে বৈদ্যুতিক রেখার মতো কাজ করে। বিনয়ের আর্তস্বরে সেই বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণ কবিতার সুরেলা মর্মর আবেদন হয়ে ভেসে ওঠে পয়ারে পয়ারে--''শব্দ দিয়ে সাগরের গভীরতা আজো মাপা হয়/ প্রশান্ত হৃদয়ে আমি বসে আছি, আমি ও কল্পনা''। বিনয়ের সমগ্র কাব্য সাহিত্যে অক্ষরবৃত্তের সাধনা... তিনি নিজেই একটা স্বতন্ত্র শৈলী। তাঁর কবিতার গভীরে প্রবেশ করলে এক অদ্ভুত নেশা পাঠককে গ্রাস করে--'ভালবাসা দিতে পারি, তোমরা কি গ্রহণে সক্ষম।' অমাবস্যার কুহক অন্ধকারে স্বপ্নের ভেতর এক দৈব মূর্তির সামনে টেনে আনেন সহৃদয় পাঠক সমাজকে। ঋষিকবি বিনয়ের কাব্যে আছে দুঃখবোধ-বিচ্ছেদ-বিরহ, আছে বিজ্ঞান আছে রহস্য-বিস্ময়। বিরহের কথা এলেই চলে আসে সেই 'ফিরে এসো চাকা'--এক আন্তর্জাতিক বিরহকাব্য ! বিরহভাবনা কবিমনের চিরবাঞ্ছিত

উপজীব্য। মিলনের একমুখীনতা সর্বজনীনতায় রূপান্তরিত হয় বিরহে। বিরহ ব্যথার মধ্য দিয়ে মুক্তির জয়েই কাব্যের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা--'প্রাচীন চিত্রের মতো চিরস্থায়ী হাসি নিয়ে তুমি/ চলে যাবে; ক্ষত নিয়ে যন্ত্রণায় স্তব্ধ হব আমি'। জীবনের ক্ষুদ্রগণ্ডিকে ছাড়িয়ে বিশ্বলোকে মিলনের শাশ্বত বাণীর ধ্বনিময় ঝঙ্কার হল 'ফিরে এসো চাকা'।

''কাগজকলম নিয়ে চুপচাপ বসে থাকা প্রয়োজন আজ;
প্রতিটি ব্যর্থতা, ক্লান্তি কী অস্পষ্ট আত্মচিন্তা নিয়ে আসে।
সতত বিশ্বাস হয়, প্রায় সব আয়োজনই হয়ে গেছে, তবু
কেবল নির্ভুলভাবে সম্পর্কস্থাপন করা যায় না এখনো।
সকল ফুলের কাছে এত মোহময় মনে যাবার পরেও
মানুষেরা কিন্তু মাংসরন্ধনকালীন ঘ্রাণ সবচেয়ে বেশি ভালবাসে।
বর্ণাবলেপনগুলি কাছে গেলে অর্থহীন, অতি স্থূল বলে মনে হয়।
অথচ আলেখ্যশ্রেণী কিছুটা দূরত্বহেতু মনোলোভা হয়ে ফুটে ওঠে।
হে আলেখ্য, অপচয় চিরকাল পৃথিবীতে আছে;
এই যে অমেয় জল--মেঘে মেঘে তনুভূত জল--
এর কতটুকু আর ফসলের দেহে আসে বলো?
ফসলের ঋতুতেও অধিকাংশ শুষে নেয় মাটি।
তবু কী আশ্চর্য, দ্যাখো, উপবিষ্ট মশা উড়ে গেলে
তার এই উড়ে যাওয়া ঈষৎ সংগীতময় হয়।''

বিনয় মজুমদার সারা জীবনে শুধুমাত্র এইকটি লাইনও যদি লিখে যেতেন, তাহলেও বাংলা কাব্য জগতে চিরন্তন হয়ে থাকতেন। কী নেই! যন্ত্রণা-বিরহ-দর্শন-বিজ্ঞান...এই বহুরৈখিক ব্যাপ্তি! তাঁর এই কবিতায় শব্দছন্দের ব্যঞ্জনা অনন্ত, যা তাঁর বক্তব্য ইঙ্গিতের ওপর পাঠকের ভাবের উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয় সহজেই। কবিতার বিষয় কেবল চিন্তাপ্রধান নয়--অনুভূতির তীব্রতাই কবিতার প্রাণ ভাবনা আর গভীর অনুভূতির মিশ্রণেই পাঠক কবিতার প্রকৃত রস পান করেন। উপরে উল্লিখিত কবিতাটির প্রথম চারটি লাইন পাঠককে নিয়ে যায় গভীর বেদনাময় অনুভূতির অন্তঃস্থলে...চিরন্তন বিরহবেদ! এই চারটি লাইনে যে 'মনখারাপ' করা কেমন কেমন অনুভূতি এটাই তো 'লোকোত্তর আহ্লাদ'। দুঃখের মধ্যে থাকে চোখভেজা আনন্দ...''তবু সব বৃক্ষ আর পুষ্পকুঞ্জ যে যার ভূমিতে দূরে-দূরে/ চিরকাল থেকে যাবে মিলনের শ্বাসরোধী কথা''। বিচ্ছেদের অনুভূতিতে এই মিলনের আকাঙ্ক্ষা শাশ্বত, যা পূর্ণ হবার নয়। আবার যখন বলেছেন---''সকল ফুলের কাছে এত মোহময় মনে যাবার পরেও/ মানুষেরা কিন্তু মাংসরন্ধনকালীন ঘ্রাণ সবচেয়ে বেশি ভালবাসে''-- বাস্তব আর পরাবাস্তবের আসা যাওয়া।

মানুষের কল্পলোকে যেখানে শিল্পের তথা সাহিত্যের জন্ম, সেখানে আবার বিজ্ঞান! বিস্ময় জাগে। শিল্পের ক্ষেত্রে বিষয়কে জানা উপলক্ষ্য মাত্র। সেখানে আত্ম উপলব্ধিই প্রধান। ভাবে জানতে হয় নিজেকে। এই জানাটা হয় ব্যক্তিনির্ভর অন্যদিকে বিজ্ঞান প্রধান রূপে জানে বিষয়কে। এই জানাতে নিজের ব্যক্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হয়। ব্যক্তি নিরপেক্ষ এই জ্ঞান খণ্ডিত ও স্বতন্ত্র। যথার্থ পর্যবেক্ষণ আর বিশ্লেষণ হল বিজ্ঞানের কাজ। সেখানে কল্পনার কোনও জায়গা নেই জায়গা নেই কোনও ধরণের জটিলতার, সংশয় বা অস্পষ্টতার। সাহিত্যের সঙ্গে এমন বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও বিনয় মজুমদার মিলিয়ে দিলেন দুটোকে। বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে ভাবকে পৌঁছে দিলেন বহুমাত্রিক চেতনায়--'হে আলেখ্য, অপচয় চিরকাল পৃথিবীতে আছে;/ এই যে অমেয় জল-- মেঘে মেঘে তনুভূত জল--/ এর কতটুকু আর ফসলের দেহে আসে বলো?/ ফসলের ঋতুতেও অধিকাংশ শুষে নেয় মাটি'। অভিধেয় অর্থে এই চারটি লাইন বিজ্ঞানের-শাশ্বত নিয়ম বা নিয়তির কিন্তু এর ব্যঞ্জনা আরও গভীর অনুভবে নিয়ে যায় পাঠককে। এক চিরন্তন জীবনদর্শন ধরা দেয় সূক্ষ্মচিত্রকল্পে। কবিতায় তিনি মেলালেন ব্যবহারিকবিজ্ঞান আর অধ্যাত্মদর্শনকে। বিনয় জীবনদর্শনের কথা ভাবেন বিজ্ঞানের চেতনা দিয়ে--

''দৃষ্টিবিভ্রমের মতো কাল্পনিক ব'লে মনে হয়
তোমাকে অস্তিত্বহীনা, অথবা হয়তো লুপ্ত, মৃত।
অথবা করেছ ত্যাগ, অবৈধ পুত্রের মতো, পথে।
জীবনের কথা ভাবি, ক্ষত সেরে গেল ত্বকে
পুনরায় কেশোদগম হবে না; বিমর্ষ ভাবনায়
রাত্রির মাছির মতো শান্ত রয়েছে বেদনা--
হাসপাতালের থেকে ফেরার সময়কার মনে।''

বলা হয়-''কবয়ঃ ক্রান্তদর্শিন''-- কবিরা সত্যদ্রষ্টা- দার্শনিক। সত্যকে উপলব্ধি করেন বলেই তিনি ভাবতে পারেন হাসপাতাল ফেরত জাঁকিয়ে বসা বেদনা ক্ষণস্থায়ী। তাই পরক্ষণেই তাঁর স্বীকারোক্তি--

'মাঝে মাঝে অগোচরে বালকের ঘুমের ভিতরে
প্রস্রাব করার মতো অস্থানে বেদনা ঝ'রে যাবে।''

বিনয় কবিতার লক্ষ্যণীয় বিষয় হল উপমা। এখানে আলোচ্য নয় ঠিকই কিন্তু বিনয়ের উপমাই তাঁর কবিতাকে বহুমাত্রা দেয়। সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন কালিদাসের উপমানৈপুণ্য বাংলায় তেমনি বিনয় মজুমদার। তাঁর উপমা পাঠকের মনে গভীর অনুভূতির উদ্রেক করে। মৌলিক তাঁর উপমা প্রয়োগ কখনো দর্শন চেতনায় সমৃদ্ধ কখনো বা বিজ্ঞানের নিয়মে বিন্যস্ত। মাটির উপরে পা রেখে জীবনের উপলব্ধি সঞ্জাত তাঁর বলিষ্ঠ উপমা বাংলা সাহিত্যে নয়--বিশ্বসাহিত্যেও দুর্লভ। বিনয় মানেই বিস্ময়। একটা মোহ। তাঁর কবিতার অর্থগৌরব পাঠককে আবিষ্ট করে রাখে। '' গুদামে তো বিস্ফোরণ হতে পারে, সেও ভালবাসা''--এমন বাক্য পড়ার পর বিস্ময় জাগে বৈকি! কবিসত্তা যখন বিশ্বসত্তায় মিশে যায় তখন অবাকরস পান করা ছাড়া পাঠকের আর কিই বা করার থাকে। তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ-- ''আমি পারি, মহাশূন্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সকল
তারা সমূহের স্থিতি একটি সমীকরণে এনে
লিখে দিতে পারি আমি।''

হ্যাঁ, তিনিই পারেন শূন্যতাকে পূর্ণতা এনে দিতে। তিনি নিজেই ঈশ্বর ঈশ্বরী, সৃষ্টি-স্রষ্টা, প্রেম-বিরহ এর যুগপৎ আধার-আধেয়। তাঁর জীবন চেতনা মূর্ত হয়েও বিমূর্ত। বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্জাত অনুভূতি তাঁর কবিতাকে পৌঁছে দেয় অতীন্দ্রিয় বিশুদ্ধ চেতনায়। 'চাকা'-- মূলত স্পর্শাতীত সৌন্দর্য অনুভবের প্রতীক...এক শাশ্বত রহস্যের অনুধ্যান। তাই তো তিনি বলতে পারেন 'প্রেম হবো অবয়বহীন'। চিরন্তন সত্যের উপাসক বিনয় মজুমদারের কবিতায় আছে প্রেম যা বিরহপুষ্ট, আছে বিজ্ঞান, আছে দর্শন-বিস্ময়। কবির স্বীকারোক্তি--''কী রহস্য যেন সর্বদা আমাকে ঘিরে রাখে''। এই রহস্য আমাদেরকেও ঘিরে রাখে। বিনয়ের সঙ্গে বলা যায় ''বিশ্বে সকল কিছুই আবৃত ও সরল দৃশ্য অবস্থায় বিদ্যমান। যে আবরণ বিশ্বে উপস্থিত ও সম্ভব কবিতাকে আবৃত ও আবদ্ধ রেখেছে, তাকে অপসারণ করলে কবিতা আবিষ্কৃত হয়।'' পাঠক আজও তাঁকে আবিষ্কার করে চলেছে।